বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা
১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : শ্রীরজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক পুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

চৈত্র ১৩৫১

আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

আদিম যুগে যখন মানুষের প্রয়োজন বেশি ছিল না তখন অভাব মেটাবার জন্য অপর লোকের কাছে যাবার দরকার তার বেশি হত না, অন্য দেশ-বিদেশে যাওয়া তো দূরের কথা। খুব আদিম যুগের বন্য মানুষ নিজেই শিকার করে আহার সঞ্চয় করত, গাছের বল্কল সংগ্রহ করে কাপড় পরত, খড়পাতা এনে নিজেই ঘর বাঁধত। নিজেই সে সব কাজ করত। তখন পরিবারও ভাল করে গড়ে ওঠে নি। ক্রমে ক্রমে পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজ গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবিভাগ আরম্ভ হল। পুরুষেরা করত শিকার, মেয়েরা করত রান্না—এই হল পরিবারের মধ্যেই শ্রমবিভাগ। তেমনি সমাজেও শ্রমবিভাগ দেখা দিল। চাষীরা চাষ করত কিন্তু কাপড় বুনত না—কাপড় বোনার ভারটা পড়ল তাঁতীর উপর। কাপড়ের দরকার পড়লে চাষীরা যেত তাঁতীর কাছে। এই থেকে বিনিময়ের উদ্ভব। সমাজের জটিলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব সময়ে আর সাক্ষাৎ বিনিময়ও সম্ভব রইল না। সেইজন্য উদ্ভাবন হল এমন একটি জিনিস যার বিনিময়-মূল্য সর্বস্বীকৃত। এই জিনিসটি হচ্ছে মুদ্রা। চাল পেলেই কাপড় দিতে রাজি থাকবে এমন লোক সব সময়ে পাওয়া কঠিন, কিন্তু মুদ্রা নিয়ে কাপড় দিতে সব তাঁতীই রাজি থাকবে, কেননা সে আবার সেই মুদ্রা দিয়ে খুশিমত জিনিস কিনতে পারে। এইভাবে মুদ্রার সাহায্যে সচ্ছন্দে বিনিময় হতে লাগল। শ্রমবিভাগের নীতি এই ধরনে ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হয়ে এসেছে। আজকালকার সমাজে যে লোক যে জিনিসটি সব চেয়ে ভাল করে তৈরি করতে পারে তাতেই সে আত্মনিয়োগ

কববার চেষ্টা করে, আর পরস্পরের প্রয়োজনমত জিনিস মুদ্রার সাহায্যে বিনিময় করে নেয়। বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন ধরনের শ্রমে নিযুক্ত, তাদের উৎপন্ন জিনিস আলাদা আলাদা।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গোড়ার কথাটা হচ্ছে এই শ্রমবিভাগ। সব মানুষ যেমন সব কাজ সহজে পারে না তেমনি সব দেশও সব কাজ সহজে পারে না। গল্প আছে, এক বৃদ্ধা কোন এক জজসাহেবের কাছে সুবিচার পেয়ে আশীর্বাদ করেছিল, জজসাহেব তুমি দারোগা হও। কার্যক্ষেত্রে যদি সত্যিই জজসাহেবকে দারোগা করে দেওয়া হয় তাহলে বিপদ হবে। বিভিন্ন দেশের বেলাতেও সেই কথা। বাংলার জমিতে পাট যেমন সহজে উৎপন্ন হয় জগতে তা আর কোথাও হয় না,—আবার মালয় দেশে রবার যেমন সহজে উৎপন্ন হয় তেমন আর কোথাও হয় না। এখানে স্বাভাবিক ব্যবস্থাই হচ্ছে মালয়দেশে পাট চাষের চেষ্টায় এবং বাংলাদেশে রবার চাষের চেষ্টায় অনর্থক অর্থ ও পরিশ্রম নষ্ট না করে যেখানে যা সহজে তৈরি হয় তাই তৈরি করে ঐ জিনিসগুলি উভয়দেশের দরকারমত বিনিময় করে নেওয়া। তাতে উভয় দেশেরই লাভ। ফরাসী দেশের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ভাল মদের উপযুক্ত আঙুর হয়, আর ভারতবর্ষের গরম আবহাওয়ায় চমৎকার চীনেবাদাম হয়। এখন যদি ফরাসী দেশ চীনেবাদাম করতে চায় তাহলে তাকে কৃত্রিম উপায়ে গরম আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে, আর ভারতবর্ষ ওরকম আঙুর উৎপন্ন করতে চাইলে তাকে কৃত্রিম উপায়ে ঠাণ্ডা আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু দুই দেশে জিনিস-বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকলে এই কৃত্রিমতার দরকার নেই ; যে জিনিস তৈরি করতে যার স্বাভাবিক সুবিধা আছে সে সেই জিনিসটিই তৈরি করবে এবং অন্যান্য জিনিস দরকারমত আমদানি করবে সেইসব দেশ থেকে যেখানে সেগুলি সহজেই তৈরি হতে পারে। সমগ্র জগত যদি একটা দেশ হত

এবং সমগ্র মানবসমাজ একটা পরিবার হত তাহলে সমস্যা অনেক সহজ হয়ে পড়ত, বিনা দরদস্তুরে যার যেখানে যে জিনিসটা দরকার সেইখানে সেই জিনিসটা পাঠিয়ে দিলেই চলত। কিন্তু ভেদাভেদ, বাদবিসম্বাদ এবং জটিলতা যত বাড়ছে, এক দেশের অভাবের সুযোগ নিয়ে অন্য দেশ নিজের স্বার্থসাধনের যেমন চেষ্টা করছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথও তেমনি জটিল ও বিকৃত হয়ে উঠছে, ঘন ঘন সংকটও দেখা দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গোড়ার কথা—আপেক্ষিক খরচ বা আপেক্ষিক লাভ

পূর্বেই বলেছি যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গোড়ার কথাটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ। যে দেশ সব চেয়ে সহজে যে জিনিস উৎপাদন করতে পারে সে দেশ সেই জিনিস উৎপাদন করবে এবং রপ্তানি করবে। তার বদলে সে আমদানি করবে এমন জিনিস যা বিদেশে অপেক্ষাকৃত সস্তায় হয় কিন্তু তা তৈরি করতে গেলে বেশি খরচ পড়ে যায়। এই জন্যই বলা হয় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সব চেয়ে গোড়ার কথা হচ্ছে আপেক্ষিক খরচ বা আপেক্ষিক লাভের নিয়ম (The Law of Comparative Cost or Comparative Advantage)।

একটা উদাহরণ হতে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। ধরা যাক,—

ইংলণ্ডে

দশ দিন একটা লোক খাটলে উৎপন্ন হয় : ২০ সের গম।
: ২০ গজ রেশম।

জার্মানিতে

দশ দিন একটা লোক খাটলে উৎপন্ন হয় : ১০ সের গম।
: ১৫ গজ রেশম।

এখানে দেখা যাচ্ছে ইংলণ্ড দুটি জিনিস উৎপাদনেই জার্মানির চেয়ে উন্নততর এবং সেইজন্য জিনিস আমদানি করার চেয়ে দুটি জিনিসই তার নিজে তৈরি করলে লাভ। তবু যদি কোনও কারণে তাকে বেছে নিতে হয় তাহলে সে গম উৎপাদনই বেছে নেবে, কারণ তাতে সে জার্মানির চেয়ে সব চেয়ে বেশি উন্নত, তাতেই তার আপেক্ষিক লাভ সব চেয়ে বেশি। আর জার্মানিকে বেছে নিতে হবে রেশম, যাতে সে পিছিয়ে আছে সব চেয়ে কম।

অবশ্য সবক্ষেত্রে তফাতটা এত সুস্পষ্ট ও বৃহৎ নয়। নিম্নলিখিত উদাহরণটি দ্রষ্টব্য :

ইংলণ্ডে

দশ দিন একটা লোক খাটলে উৎপন্ন হয়	:	২০ সের গম।
	:	১০ গজ রেশম।

জার্মানিতে

দশ দিন একটা লোক খাটলে উৎপন্ন হয়	:	১০ সের গম।
	:	১৫ গজ রেশম।

এক্ষেত্রে উভয় দেশের কর্তব্যই সুস্পষ্ট। ইংলণ্ডের চেয়ে জার্মানি অপেক্ষাকৃত কম খরচে রেশম উৎপন্ন করতে পারে, আর ইংলণ্ডের সুবিধা আছে গম উৎপাদনে। সুতরাং ইংলণ্ড গম উৎপাদন করবে এবং জার্মানি রেশম উৎপাদন করবে। ইংলণ্ড দরকারমত রেশম আমদানি করবে জার্মানি থেকে, জার্মানি দরকারমত গম আমদানি করবে ইংলণ্ড থেকে। এরকম ব্যবস্থা হলে উভয়েরই সুবিধা, উভয়েরই আপেক্ষিক লাভ।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দেশে দেশে এরকম আপেক্ষিক খরচ তফাত হয় কেন? প্রাচীন পণ্ডিতদের মধ্যে ধারণা ছিল, কাঁচা মাল বা মূলধন এ সবে তো কোনও তফাত নেই, তফাতটা হচ্ছে মজুরির হারের। কোনও

দেশের শ্রমিকেরা দাবি করে পাঁচ টাকা রোজ, কোথাও বা তাদের রোজ আট আনা। দেশে দেশে শ্রমিক-চলাচল সহজ নয় বলে এই তফাতটা থেকে যায় এবং তাই থেকেই আপেক্ষিক লাভের তফাত ঘটে। কিন্তু একথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। যে-কোনও জিনিস উৎপাদন করতে চারটি জিনিস দরকার। প্রথম দরকার কাঁচা মাল; তা ছাড়া দরকার পরিশ্রম; সেইসঙ্গে দরকার মূলধন, আর দরকার ব্যবসায়বুদ্ধি ও মাথা-খাটান। কাঁচামাল, মূলধন বা পরিশ্রম ছাড়া কোনও জিনিস হতে পারে না একথা সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু এ সবের সঙ্গে ব্যবসায়বুদ্ধি না থাকলে সবই বৃথা হতে পারে। সুতরাং উৎপাদনের জন্য ঐ চারটিই সমান অপরিহার্য। এখন, এই চারটির যে-কোনওটি সংগ্রহ করবার খরচের ইতরবিশেষ হলে উৎপাদন-খরচেরও ইতরবিশেষ হতে বাধ্য। ধরা যাক, কাঁচা মালের দাম, মজুরির হার বা মূলধনের সুদ চড়ে গেল। এক্ষেত্রে উৎপন্ন জিনিসের দামও বাড়তে বাধ্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আপেক্ষিক লাভ নির্ভর করে এই সব কয়টি জিনিসের উপরই। যেখানে কোনও জিনিস অন্য দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সস্তায় উৎপন্ন হয় সেখানে বুঝতে হবে ঐ চারটি উৎপাদকের কোনওটি বা সব ক'টিই অন্য দেশের তুলনায় ঐ দেশে সস্তা। একটা কাল্পনিক উদাহরণ নেওয়া যাক। ভারতবর্ষে রেশম তৈরি করতে গজ প্রতি পাঁচ টাকার কমে হয় না, জাপানি সিল্ক সেখানে ভারতের বাজারে তিন টাকা গজে পাওয়া যায়। ধরা যাক, জাপানি সিল্ক যখন এখানে তিন টাকা গজে বিক্রি হচ্ছে তখন তা তৈরি করতে জাপানের এই রকম খরচ পড়ে: (১) কাঁচা রেশম আট আনা, (২) মজুরি আট আনা, (৩) মূলধনের সুদ আট আনা, (৪) ব্যবসায়ীদের লাভ এক টাকা, (৫) পাঠাবার খরচ (জাহাজভাড়া, শুল্ক ইত্যাদি) আট আনা। যদি কোনও কারণে কাঁচা রেশমের দর চড়ে গেল, বা মজুরেরা ধর্মঘট করে

মজুরির হার বাড়িয়ে নিল, বা ব্যবসায়ীরা মনে করলেন দু'টাকা লাভ না পেলে তাঁদের রেশম-ব্যবসা তুলে দিয়ে অন্য আরও মোটা লাভের ব্যবসা করা ভাল তাহলে জাপানি রেশমের দাম বেড়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার দাম ভারতীয় বাজারে পাঁচ টাকার কম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত জাপানি রেশম ভারতে আসবে। তার চেয়ে দাম চড়ে গেলে তা আর আসবে না, কেননা, তখন জাপানেরও কোনও আপেক্ষিক কম খরচ থাকবে না,—আর সে জিনিস কেনায় ভারতবর্ষেরও কোনও আপেক্ষিক লাভ থাকবে না! অবশ্য, উৎপাদনের মধ্যে আরও অনেক জটিলতা আছে। যেমন, উৎপাদন ব্যাপারে একটা প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে জিনিসটি বেশি পরিমাণে উৎপাদন করলে পড়তা কম হয়, না বেশি হয়। যে জিনিস বেশি উৎপন্ন হলে পড়তা কম হয় সেসব জিনিসের উৎপাদন-খরচ একদিকে যদিও বেড়ে যায় তাহলেও শেষ পর্যন্ত মোট খরচ না বাড়তেও পারে যদি ইতিমধ্যে তার বিক্রিও বেড়ে যায়। সুতরাং কোনও জিনিসের দাম নির্ভর করে একদিকে উৎপাদন-খরচ কত তার উপরে, অন্য দিকে তার চাহিদা কি রকম তীব্র তার উপরে। যে জিনিস না হলে চলে না তার দাম বাড়লেও তার বিক্রি কমবে না, অন্ততঃ বেশি কমবে না। যে জিনিস না হলেও চলে সেসব জিনিস সস্তায় পেলে হয়তো অনেক লোকেই কিনবে, কিন্তু তার দাম চড়লে আর কিনবে না। এইভাবে কোন জিনিসটি কখন কি খরচে কত পরিমাণ উৎপন্ন হবে তা নির্ভর করে চাহিদা ও সরবরাহের ঘাতপ্রতিঘাতের উপর। যেখানে চাহিদা ও সরবরাহ মিলে গিয়ে ভারসাম্য হয় সেইখানেই দাম স্থির হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও জিনিস চলাচলের আধুনিকতম তত্ত্ব এই-ই, আপেক্ষিক লাভের নিয়মের ব্যাখ্যা আজকাল এইভাবেই করা হচ্ছে। প্রত্যেক জিনিস তৈরি করতেই কতকগুলি উৎপাদকের দরকার হয়,

বিভিন্ন দেশে (বা একই দেশে বিভিন্ন সময়ে) তার দাম এক নয়। যে দেশে যে-যে জিনিস তৈরি করতে উৎপাদকগুলি অপেক্ষাকৃত সস্তায় পাওয়া যায় সেই জিনিসগুলিই রপ্তানি হয়, এবং যে জিনিসের উৎপাদকগুলি অন্য দেশের তুলনায় আক্রা সেগুলি অন্য দেশ, যেখানে সেগুলি অপেক্ষাকৃত সস্তা, সেখান থেকে আমদানি হয়। সুতরাং আপেক্ষিক লাভের জন্য দায়ী উৎপাদন-খরচ অর্থাৎ উৎপাদকগুলির দাম।

আন্তর্বাণিজ্যে যেমন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও সেইরকম, এই উৎপাদন-খরচ অনড় অচল থাকতে পারে না। উৎপাদন-খরচ ও চাহিদা অনবরতই বদলাচ্ছে। সুতরাং আজ যেখানে আপেক্ষিক লাভ আছে কাল সেখানে আপেক্ষিক লাভ না-ও থাকতে পারে। উৎপাদন-খরচ ও চাহিদার যে একটা বিশেষ অবস্থায় আপেক্ষিক লাভ থাকছে এবং তার ফলে জিনিস চলাচল ঘটছে খরচ বা চাহিদার অবস্থা বদলে গেলে সেই আপেক্ষিক লাভেরও বদল হতে পারে এবং তার ফলে জিনিস চলাচলেরও তারতম্য ঘটতে পারে। সুতরাং আপেক্ষিক লাভ বা জিনিস চলাচল নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদা ও সরবরাহের উপর। ও দুটিই পরস্পরকে সদাসর্বদা প্রভাবান্বিত করছে এবং সেই কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সদাসর্বদাই নতুন নতুন ভারসাম্য হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা অবশ্য এতদূর এগোতে পারেন নি। পূর্বেই বলেছি তাঁরা প্রথম প্রথম বলতেন (আর তখন বাস্তব অবস্থাটাও তাই ছিল) যে একটা দেশের মধ্যে যেমন শ্রমিকেরা সচ্ছন্দে একটা শিল্প থেকে আর একটা শিল্পে যেতে পারে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সেরকম সচ্ছন্দ শ্রম-চলাচল সম্ভব হয় না। সুতরাং একটা দেশের মধ্যে যেমন মজুরি নির্ধারিত হয় তাদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা[১], আন্তর্জাতিক

১। প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বলতে Marginal Productivity of Labour

বাণিজ্যে তা হয় না। সুতরাং আন্তর্বাণিজ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তফাত কেবলমাত্র এইখানেই। প্রান্তিক মজুরির হার এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন হয়ে যায় এবং তা হতেই আপেক্ষিক লাভের তারতম্য ঘটে।

কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এ মত এখন চলতে পারে না। উৎপাদন-খরচ নির্ভর করে শুধু মজুরির হারের উপর নয়, আরও অন্যান্য উৎপাদকের উপরেও। দেশে দেশে উৎপাদন-খরচের তফাত শুধু যে মজুরি হারেরই হতে পারে তা নয়, কাঁচা মাল বা মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারেও হতে পারে। আর আজকাল উৎপাদন-পদ্ধতি এত জটিল যে একটি শিল্পে যে শ্রমিক অভিজ্ঞ অন্য শিল্পে সে হয়তো কোনও কাজেই লাগবে না। সুতরাং একটা দেশের মধ্যে সচ্ছন্দে শ্রম-চলাচল হতে পারে এ কথাটাও সত্য নয়।

আপেক্ষিক লাভের জন্য মজুরিহারের পার্থক্যই যে একমাত্র দায়ী নয় এ কথাটা মার্শাল স্পষ্ট স্বীকার না করলেও আকারে-ইঙ্গিতে বলবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এর জন্য একটা দুরূহ পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। একটা জিনিস তৈরি করতে খানিকটা

বুঝছি। প্রান্তিক কথাটার অর্থ এইরকম :—রাম সব চেয়ে দক্ষ মজুর, শ্যাম তার চেয়ে কম দক্ষ, যদু তার চেয়ে আরও কম দক্ষ, হরি আরও কম দক্ষ। একটা ক্ষেতে দশ মণ আলু ফলাতে গেলে রাম, শ্যাম ও যদুকে দরকার, তিনজন না হলে সে ক্ষেতটি চাষ হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে মজুরির হার স্থির হবে যদুর ক্ষমতার দ্বারা, কারণ যদুকে না হলেও চাষ হয় না। যদু হচ্ছে প্রান্তের লোক, তার তলার লোকেরা অচল। ধরা যাক, কোনও কারণে চাহিদা বেড়ে গেল এবং আগে যেখানে এক বিঘে জমিতে চাষ হচ্ছিল এখন দেড়বিঘে জমিতে চাষ হতে লাগল। তখন হরিকেও দরকার হবে, সে-ই তখন হবে প্রান্তের লোক এবং তার মজুরির হারই প্রান্তিক হার। তারপর যদি আরও শ্রমিকের দরকার হয় তাহলে এখনও যারা প্রান্তের নিচে আছে তারা প্রান্তের এপারে চলে আসবে।

শ্রম ও খানিকটা মূলধন দরকার। তাঁর ভাষায় একটা representative bale-এর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ও মূলধন সংযুক্ত আছে। জার্মানির তার ২০টি bale দিয়ে ইংলণ্ডের ২৫টি bale নিতে প্রস্তুত থাকবে কিনা তা নির্ভর করে উভয়ের চাহিদার অবস্থার উপরে। ধরা যাক্, ২০টি গাঁটের বদলে ২৫টি গাঁট পেলে জার্মানির আপেক্ষিক লাভ, আর ঐ হারে বিনিময়ে ইংলণ্ডেরও লাভ, ২০টি জার্মান গাঁটের বদলে নিজের ২৫টি গাঁট অবধি দিলে তার লোকসান হয় না। এক্ষেত্রে বিনিময়ের হার ঠিক ২৫ : ২০ হবে, না ২৪ : ২০ হবে বা ২৩ : ২০ হবে তা নির্ভর করে অপর সমস্ত জিনিস অপরিবর্তিত থাকলে ইংলণ্ডের ও জার্মানির চাহিদার উপর।

কিন্তু এত ঘুরিয়ে এই কথা না বলে কথাটি স্পষ্টতই বলা ভাল যে আন্তর্জাতিক জিনিস চলাচল হবে কি না তা নির্ভর করে আপেক্ষিক লাভের উপর এবং আপেক্ষিক লাভ আবার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদা ও সরবরাহের উপর। ওহ্‌লিন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই কথাই বলতে চাচ্ছেন।

এই কথা বললেই সঙ্গে সঙ্গে আর এক ধাপ এগোতে হয়। বোঝা গেল, আন্তর্জাতিক জিনিস চলাচল নির্ভর করে আপেক্ষিক লাভের উপর এবং আপেক্ষিক লাভ নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদা ও সরবরাহের উপর। কিন্তু এই পারস্পরিক চাহিদা ও সরবরাহ আবার নির্ভর করে কিসের উপর? এদের অবস্থা বদলের কি কারণ? এরকম কারণ অনন্ত, তার সীমা নির্ণয় করা যায় না; কিন্তু মোটামুটি কয়েকটা নিয়ম স্থির করতে পারা যায়।

আন্তর্বাণিজ্যে দেখা যায়, কতকগুলি জিনিসের চাহিদা অনেকটা অনড় অচল, আবার কতকগুলি জিনিসের চাহিদা দাম কমা-বাড়ার

সঙ্গে তাড়াতাড়ি কমে বাড়ে। যেমন খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা সবসময়েই তীব্র থাকবে, কিন্তু বিলাসিতার জিনিস অনেক সময় সস্তায় পাওয়া গেলে অনেকে কিনতে রাজি থাকেন, আক্রা হলে নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও এরকম বিভিন্ন রকমের চাহিদা আছে। এই জন্য কেউ কেউ বলেন যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ছোট ছোট দেশগুলি অপেক্ষাকৃত বেশি লাভবান হয়, কারণ তারা বিশেষ বিশেষ ধরনের জিনিস তৈরি করতে সহজেই পটুত্ব অর্জন করে থাকে, আর বিশেষ ধরনের জিনিসের চাহিদা সহজে কমে না। আবার বলা হয়ে থাকে যে অপেক্ষাকৃত বড় ও ধনী দেশের পক্ষে অপেক্ষাকৃত লাভ করা বরং সহজ, কারণ তারা যেমন অনেক জিনিস এবং বহুবিধ জিনিস তৈরি করতে পারে এবং সেইজন্য তাদের যেমন দুই-একটি রপ্তানিযোগ্য জিনিসের উপর নির্ভর করতে হয় না তেমনি তাদের চাহিদাও সাধারণত অনড় অচল হয় না, স্থিতিস্থাপক হয়, কেননা তারা সাধারণত অতিপ্রয়োজনীয় (এবং সেইজন্য সব অবস্থাতেই অপরিহার্য) জিনিস ছাড়াও আরও নানারকম জিনিস আমদানি ও রপ্তানি করে থাকে। এ কথাগুলি সত্য, কিন্তু আপেক্ষিক সত্য। অনেক সময় ঐ কথাগুলি সত্য হয় বটে, কিন্তু সব সময়ে সত্য না-ও হতে পারে। ছোট দেশগুলির যেমন লাভবান হবার সম্ভাবনা থাকে তেমনি যখন সংকট দেখা দেয় তখন বড় দেশগুলিরই ছোট দেশগুলির চেয়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা বেশি, কারণ তাদের একটি-দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করতে হয় না।

দামের কথা আলোচনার সময় আন্তর্বাণিজ্যের তুলনায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটা পার্থক্য খুব বড় রকম হয়ে দেখা দেয়। কোনও একটা দেশে যে-যে জিনিস তৈরি হয় তার সবগুলিই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য নয়। অনেক জিনিস হয়তো স্বদেশেই সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয়, অনেক

জিনিসের কেবল আধাআধি হয়তো রপ্তানি হয়, আবার অনেক জিনিসের হয়তো বেশির ভাগই বিদেশে যায়। এই রকম বিভিন্ন ধরনের জিনিসের দামের স্তর অনেক সময় তফাত হয়ে পড়ে, তার কারণ তাদের চাহিদা-সরবরাহের অবস্থা অনেক সময়েই এক নয়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ভারতবর্ষে পাট উৎপন্ন হয় অনেকটা রপ্তানির জন্য, কিন্তু চাল উৎপন্ন হয় অধিকাংশই স্বদেশে ব্যবহারের জন্য। ধরা যাক্, কোনও কারণে ইংলণ্ডে ভারতীয় পাটের চাহিদা দশ বছর ধরে খুব বেশি রইল, তার ফলে পাটে লাভ থাকল প্রচুর। তা হলে পাটচাষী যে লাভ পাবে, পাটকলের মজুর যে মজুরি পাবে তা ধানচাষীর লাভের চেয়ে বা ধানকলের মজুরির চেয়ে বেশি হবার সম্ভাবনা। এই পার্থক্য আরও অনেক দূর প্রসারিত হতে পারে। পাটচাষী বা পাট-মজুরেরা যেসব জিনিসপত্র কেনে আর ধানচাষী বা ধানকলের মজুরেরা সাধারণত যেসব জিনিস কেনে, সেগুলির দামও এর ফলে তফাৎ হতে পারে। এইভাবে 'স্বদেশী' (অর্থাৎ স্বদেশে ব্যবহৃত) জিনিসের দাম-পর্যায় এবং 'বিদেশী' (অর্থাৎ বিদেশে রপ্তানির জন্য তৈরি) জিনিসের বা 'দো-আঁশলা' জিনিসের দাম-পর্যায় অনেক সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষ তফাত হয়ে পড়ে। 'থিওরি'তে অবশ্য বলা চলে যে এই রকম বৈষম্য বেশি দিন থাকতে পারে না, কারণ পাটচাষে বেশি লাভ হলে ভারতবর্ষেও যেমন ধানচাষ কমিয়ে পাটচাষের চলন বেশি হবে এবং সেই কারণে প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন হলে পাটচাষে লাভ কমবে, অন্য দিকে তেমনি ইংলণ্ডেও পাটকল প্রয়োজনের বেশি হবে এবং সেখানেও গোলমাল দেখা দেবে। এইভাবে আবার ভারসাম্য হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে, বিশেষত ইদানীং, এরকম ভারসাম্য প্রায়ই ঘটে না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে অত সহজে একটা শিল্পে নিয়োজিত শ্রম বা মূলধন

আর একটা শিল্পে এনে ফেলা যায় না। যেমন, পাটের জমি আর ধানের জমি কি এক? ইচ্ছা করলেই কি ধানের জমিতে পাটচাষ হতে পারে? তেমনি পাটকল গড়ে তোলার পর রাতারাতি কি সেগুলিকে গেঞ্জীকল বা অন্য কলে বদলে ফেলা যায়? তা হয় না। সুতরাং থিওরির ভারসাম্যও এখানে সহজে হতে পারে না। বর্তমানে এই রকম উৎপাদন-ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত অনড়ভাব ও অনমনীয়তার জন্য দাম-পর্যায়ের বৈষম্যও ক্রমেই দৃঢ় হয়ে উঠছে এবং সংরক্ষণ-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিতে তা আরও দৃঢ়ীভূত হচ্ছে। দরকারমত অদলবদল সহজে আপনাআপনি হচ্ছে না।

এই কারণে আজকাল সংকটের সম্ভাবনাও বেশি হয়েছে। আগে সারা জগতময় একটা স্বয়ংক্রিয় স্বর্ণমান ছিল। স্বর্ণমানের গোড়ার কথা হচ্ছে দুটি; প্রথমত, গবর্মেণ্ট একটা নির্দিষ্ট হারে তাঁদের মুদ্রার পরিবর্তে সোনা দিতে সব সময়েই প্রস্তুত থাকবেন; দ্বিতীয়ত, মুদ্রার পরিমাণের সঙ্গে সোনার পরিমাণের একটা সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকবে। ধরা যাক্, আমেরিকার ডলারের বদলে সবসময়েই ডলার প্রতি এক আউন্স সোনা পাওয়া যাবে, এবং প্রতি একশো ডলার চালু থাকলে তার পিছনে চল্লিশ আউন্স সোনা রাখতে হবে এই নিয়ম আছে। ধরা যাক্, ইংলণ্ডের দামের তুলনায় আমেরিকায় দামের স্তর উঁচু। তাহলে ইংলণ্ড থেকে বহু জিনিস আমেরিকায় এসে পড়বে এবং তার দাম দেবার জন্য আমেরিকাকে সোনা ছাড়তে হবে। আমেরিকা হতে সোনা ইংলণ্ডে চলে এলে ইংলণ্ডে ঘটবে মুদ্রাস্ফীতি অর্থাৎ দাম চড়বে এবং আমেরিকায় হবে তার উল্‌টো অবস্থা, অর্থাৎ দাম পড়বে। এই রকম করে আবার ভারসাম্য স্থাপিত হবে। কিন্তু এখন এরকম স্বর্ণমান আর নেই। সেইজন্য এখন দাম-পর্যায়ের ওঠা-নামা আর আগের মত সোনা চলাচলের মধ্য দিয়ে হয় না, আরও জটিল-ভাবে হয়। কোনও

একটা দেশের 'বিদেশী' ও 'দো-আঁশলা' জিনিসের সঙ্গে অপর দেশের 'বিদেশী' ও 'দো-আঁশলা' জিনিসের লেনদেনের ভিতর দিয়ে দাম-পর্যায়ে ঘাতপ্রতিঘাত হয় এবং তারই ফলে কোন্ উৎপাদকের কি দাম হবে এবং কোন্ শিল্পে বেশি ঝোঁক পড়বে এগুলিও নিরূপিত হয়। আজকাল এই নিয়ে জটিলতা বেড়েই চলেছে। সব দেশের শিল্প-বাণিজ্যে 'বিদেশী' বা 'দো-আঁশলা' জিনিসের গুরুত্ব সমান নয়; অনেক দেশকে আবার 'স্বদেশী' জিনিসের জন্যও 'বিদেশী' জিনিসের (যথা বিদেশ হতে আমদানি কাঁচামাল) মুখ চেয়ে থাকতে হয়; অনেক সময় শিল্পের স্বার্থে দাম কমাবার দরকার হলেও মজুরদের স্বার্থে এরকম দাম কমান চলে না; যুদ্ধের ভয়ে বেশি খরচ পড়লেও অনেক জিনিস স্বদেশেই তৈরি করতে হচ্ছে; তা ছাড়া সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ বেড়েই চলেছে। এই সব কারণে দাম-পর্যায়ের ঘাতপ্রতিঘাতও জটিল হয়ে উঠেছে।

"টার্ম অফ ট্রেড" বা আপেক্ষিক লাভের পরিমাপ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লাভের কমতি-বাড়তি দুদিকে হতে পারে। মোট লাভ বাড়তে পারে যদি ইউনিট পিছু লাভের মাত্রা বাড়ে। আর যদি ইউনিট পিছু লাভের মাত্রা না-ও বাড়ে তাহলেও মোট লাভ বাড়তে পারে যদি মোট বাণিজ্যের বিস্তার হয়। সুতরাং লাভবৃদ্ধি নির্ভর করে বাণিজ্যের বিস্তারের উপর (Volume of Trade) এবং জিনিস বিনিময়ের হারের (Term of Trade) উপর। এই টার্ম অফ্ ট্রেড অনেক কারণে বদলায়, তার মধ্যে প্রধান কারণ এইগুলি: (১) চাহিদার অবস্থা। যে-সব দেশের আমদানির চাহিদা অনড় এবং তীব্র সে-সব দেশকে অন্য দেশের জিনিস আমদানি করতেই হয়, তার জন্য নিজেদের জিনিস পূর্বের তুলনায় বেশি দিতে হলেও। সে সব ক্ষেত্রে নীট বিনিময়-

হার[২] আমদানিকারকের বিপক্ষে যাবারই সম্ভাবনা। ধরা যাক্, ইংলণ্ডে ভারতীয় পাটের চাহিদা এমন অনড় যে পাটের দাম যাই হোক না কেন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ (ধরা যাক্, এক লক্ষ গাঁট) পাট তার চাই-ই। সুতরাং যদি পাটের দাম চড়ে যায় তাহলে অবস্থা দাঁড়াবে এই যে আগে যে পরিমাণ কলকব্জা বা অন্য জিনিস দিয়ে সে একলক্ষ গাঁট পাট আমদানি করছিল এখন সেই একলক্ষ গাঁট পাট পাবার জন্য আরও বেশি পরিমাণ কলকব্জা ও অন্যান্য জিনিস দিতে হবে। তাহলে বিনিময়-হার ইংলণ্ডের বিপক্ষে গেল। (২) উৎপাদন-খরচের হ্রাসবৃদ্ধি। দেখা গেছে, অনেক জিনিস বেশি পরিমাণে উৎপাদন হলে তার পড়তা কম হয়। পূর্বের উদাহরণটিই নেওয়া যাক্। ধরা যাক্, ইংলণ্ডে ভারতীয় পাটের চাহিদা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে পাটচাষ বাড়ল এবং চাষের এমন উন্নতি হল যে, গাঁটপ্রতি পড়তা পূর্বের তুলনায় কমে গেল। এক্ষেত্রে উৎপাদন-খরচের পড়তা কমে যাওয়ায় যদি পাটের দাম কমে তাহলে ইংলণ্ডের চাহিদা বাড়লেও তার নীট বিনিময়-হার বিপক্ষে গেল না, কারণ তার

২। নীট বিনিময়-হার কথাটার অর্থ একটু পরিষ্কার করা দরকার। জিনিস বিনিময়ের হার দু'রকম হতে পারে, নীট ও বে-নীট (Gross)। ইংলণ্ড থেকে চল্লিশ মণ লোহা গেল, জার্মানি থেকে চল্লিশ মণ কাঁচ এল, সুতরাং বিনিময়-হার হল ১ : ১—এটা হচ্ছে বে-নীট বিনিময়-হার। এই জিনিস চলাচলের মধ্যে সবটাই হয়তো জিনিসের বদলে জিনিস চলাচল হয় নি, তার মধ্যে খানিকটা হয়তো মূলধন চলাচলের বদলে জিনিস চলাচল আছে। ধরা যাক্, জার্মানি যে চল্লিশ মণ কাঁচ দিচ্ছে তার ২০ মণ দিচ্ছে ইংলণ্ডের চল্লিশ মণ লোহার বদলে আর বাকি ২০ মণ দিচ্ছে ইংলণ্ড থেকে একশো পাউণ্ড স্টার্লিং মূলধন পেয়ে। এখানে বাস্তবিকপক্ষে শুধু জিনিসের হিসেব ধরলে বিনিময়-হার হবে ২ : ১। এটির নাম নীট বিনিময়-হার। অর্থাৎ অন্য সমস্ত কারণে জিনিস চলাচল বাদ দিয়ে শুধু জিনিসের সঙ্গে জিনিসের বিনিময়ের যে হার সেটিই নীট বিনিময়-হার।

চাহিদা বাড়ার ফলে এদেশে উৎপাদন-খরচও সেই সঙ্গে সঙ্গে এমন বদলে গেছে যে পূর্বের লাভ (বা তার চেয়ে বেশি লাভ) রেখেও ভারতবর্ষ পূর্বের দামে পাট দিতে পারছে। (৩) শুল্কহার। শুল্ক বসালে দেশের বাজারে বিদেশী জিনিসের দাম চড়ে যায়। সেইজন্য শুল্ক বসানোর ফল দাম চড়ার ফলাফলের মতই হবে। সেক্ষেত্রে যদি চাহিদা সরবরাহ সহজে বদল করা না চলে তাহলে নীট বিনিময়-হার বিরুদ্ধে যাবারই সম্ভাবনা। (৪) জিনিস পাঠাবার খরচ। এক দেশ থেকে অন্য দেশে জিনিস পাঠাবার খরচ (যথা রেলভাড়া, জাহাজভাড়া ইত্যাদি) বেড়ে গেলেও দাম চড়ার অনুরূপ ফল হবে। (৫) একতরফা খরচ যদি বাড়ে (যথা, মূলধন চলাচল, যুদ্ধের খেসারত ইত্যাদি) তাহলেও তার প্রভাব নীট বিনিময়-হারের উপর পড়বে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে আছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রথম কথা—জিনিস চলাচল

তা হলে দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সব চেয়ে গোড়ার কথা আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ। আপেক্ষিক লাভের নিয়ম সেই কথাকেই বোঝায়। জিনিস চলাচল হবে কিনা তা স্থির হয় আপেক্ষিক লাভ থাকবে কিনা সেই বুঝে। আপেক্ষিক লাভ থাকে তার কারণ বিভিন্ন দেশের চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা এক নয়, কোন দেশে কোন জিনিস তৈরি করতে উৎপাদকগুলি সস্তায় মেলে। চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা আবার সর্বদাই বদল হচ্ছে এবং পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করছে। চাহিদার তীব্রতাও যেমন সব জিনিসের জন্য সব দেশের সমান নয়, সরবরাহও তেমনি অবস্থাভেদে বদল হয়ে থাকে। একটা বিশেষ অবস্থায় যে লাভ রেখে উভয় দেশ জিনিস লেনদেন করে তারই পরিমাপ হচ্ছে

নীট বিনিময়-হার। এই হারের বদল হলে বুঝতে হবে, আপেক্ষিক লাভে অর্থাৎ চাহিদা-সরবরাহে কোথাও বদল ঘটেছে। আগে এইরকম বদল ঘটলে তা এক দেশের মধ্যে সমস্ত শিল্পশরীরে এবং ক্রমশ এক দেশ থেকে সমস্ত জগতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত; বর্তমানে নানারকম জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে অনেক সময় বিভিন্ন দাম-পর্যায় গড়ে উঠেছে, তার ফলে আপনা হতে ওরকম বদল অনেক সময় ঘটে না, সচেতন ভাবে হিসেব করে বদল করে দিতে হয়, আর তা না হলেই সংকট ঘটে। এইটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রথম কথা।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বিতীয় কথা— মূলধন চলাচল

পূর্বে যে কথাগুলি বলা হল এইবার সেগুলিকে অন্য দিক্ থেকে একটু আলোচনা করা দরকার। জিনিস চলাচল কেন হয় তার সবচেয়ে গোড়ার কথাটাই এ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দুটি দেশের মধ্যে কারবার কি শুধু জিনিসেই হয়? কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা দরকার। আপেক্ষিক লাভের হিসাবে কষে দেখা গেল জার্মানি থেকে যখন তার কুড়িটি চশমার কাঁচ আনতে হবে তখন ইংলণ্ড তার জন্য নিজের পঁচিশটি পর্যন্ত কাপড়ের থান দিলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু ধরা যাক্, ইংলণ্ডের দরকার হল চল্লিশটি চশমার কাঁচের। তখন সে সেই চল্লিশটি কাঁচের দাম কি করে দেবে? চাহিদা-সরবরাহের অবস্থা যদি পূর্বের মতই থাকে তাহলে চল্লিশটি কাঁচের জন্য এখন তাকে পঞ্চাশটি থান পাঠাতে হবে। যদি ইংলণ্ডের হাতে পঞ্চাশটি থান থাকে তাহলে তো নিশ্চিন্ত। কিন্তু তা যদি না থাকে তাহলে কি হবে? আপাতত মনে হয়, তাহলে ইংলণ্ডের পক্ষে চল্লিশটি কাঁচ আমদানি করা সম্ভব হবে না, কেননা চল্লিশটি

কাঁচের প্রতিদানে দেবার উপযুক্ত জিনিস (অর্থাৎ চল্লিশটি কাঁচের দাম) তার হাতে নেই। এই কারণেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটা স্বতঃসিদ্ধ হচ্ছে Exports must pay for imports—অর্থাৎ যা আমদানি করা হচ্ছে তা পুষিয়ে দেবার মত রপ্তানি হওয়া চাই—দুটি শেষ পর্যন্ত মিলে যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই রকম একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার কারণ আন্তর্বাণিজ্যের মত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি সর্বদেশগ্রাহ্য মুদ্রা নেই। বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের হাটে চাষী ধান নিয়ে এল, ধানের বদলে কাপড় নিল, নুন নিল, হালের ফলা কিনল। যদি মুদ্রার কারবার না থাকত তাহলে তার যতটুকু জিনিস কিনতে হল ঠিক তার সমান বিনিময়-মূল্যের ধান তার কাছে থাকা চাই, তার আমদানি ও রপ্তানি সমান হতে বাধ্য। কিন্তু মুদ্রার চলন আছে বলে তার হাতে ধান কম থাকলেও কিছু যায় আসে না যদি তার কাছে ধানের সঙ্গে আর দুএকটা টাকা থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জিনিসের দাম দেওয়া হয় জিনিসে। ভারতবর্ষ ধান চাল রপ্তানি করছে তার যে সব জিনিসের অভাব আছে সেইসব আমদানি করবার আশায়। কিন্তু তার বদলে ইংলণ্ড যদি সেইসব জিনিস না পাঠিয়ে কতকগুলি নোট ভারতবর্ষকে দেয় তাতে অভাব মিটবে না। টাকার মানেই হচ্ছে যখন খুশি জিনিস কিনতে পারব। এমন টাকা নিয়ে করব কি, যদি তার বদলে কোথাও জিনিস না পাই। সুতরাং শেষ পর্যন্ত রপ্তানি ও আমদানির সাম্য হওয়া চাই। তা নইলে জিনিস দিয়েই যাব, তার বদলে কোনও জিনিস পাব না, এ রকম লোকসান দিয়ে তো ব্যবসা হয় না।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সব সময়ে জিনিসের দাম জিনিসে নেবার দরকার হয় না, সেখানেও নোটের বা

হ্যাণ্ডনোটের কারবার কিছুদূর অবধি চলতে পারে। পূর্বের উদাহরণটি আবার নেওয়া যাক্। চল্লিশটি জার্মান চশমার কাঁচের জন্য ইংলণ্ডকে তার পঞ্চাশটি কাপড়ের থান দিতে হবে কিন্তু তার হাতে তখন মাত্র ত্রিশটি থান আছে। সে যদি বাকি কুড়ি থান না দিয়ে তার দামের সমান সোনা দিয়ে জার্মানি হতে চল্লিশটি কাঁচ আমদানি করে তাহলে জার্মানির আপত্তি হবার কোনও কারণ নেই, কেননা সোনা হচ্ছে এমন একটি জিনিস যার সাহায্যে জার্মানি আবার অন্য দেশের কাছে তার দেনা মিটাতে পারে। এক্ষেত্রে যদি কিছু সোনা চলাচল হয় তাহলে উভয় দেশেরই আমদানি ও রপ্তানির জিনিসের পরিমাণ নিশ্চয়ই সমান হবে না। তেমনি সোনার মত মূলধন-চলাচলও হয়। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডে ধানচাল রপ্তানি করছে। তার বদলে ইংলণ্ড ভারতে কোন জিনিস না পাঠিয়ে ভারতবর্ষকে তার পাওনা মেটাল ভারতবর্ষের নামে স্টার্লিং লিখে দিয়ে। যদি সেই স্টার্লিং নিয়ে সেই স্টার্লিং-এর সাহায্যে অন্য দেশ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার সহায়তা হয় তাহলে ভারতবর্ষের স্টার্লিং-এ পাওনা মিটিয়ে নিতে কোনও আপত্তি নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানি সমান হবে না; তার কারণ কিছু পাওনা জিনিসে মিটিয়ে নেওয়া হল আর বাকি পাওনা নগদ নেওয়া হল।

আন্তর্জাতিক ঋণদানের কথা হামেশাই শোনা যায়। ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তার করতে হবে, কিন্তু তার এত টাকা নেই। ইংলণ্ড তাকে টাকা ধার দিল। এই টাকা ধার কি ভাবে দেওয়া যেতে পারে? ইংলণ্ড তার নামে নগদ স্টার্লিং লিখে দিতে পারে, ভারতবর্ষ সেই স্টার্লিং নিয়ে কানাডা, আমেরিকা থেকে ইঞ্জিন প্রভৃতি আমদানি করতে পারে। অথবা ইংলণ্ড নিজেই ঐ সব জিনিসপত্র পাঠাতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে যদিও ভারতবর্ষ জিনিস আমদানি করছে কিন্তু তখনই তাকে

তার দাম দেবার জন্য জিনিস রপ্তানি করতে হচ্ছে না। ঋণদানের ফলে খানিকটা একতরফা জিনিস চলাচল হচ্ছে। তার পরবর্তী অবস্থাটার কথা এবার ভাবা যাক্। ঐ টাকা দিয়ে ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তার হল, খুব লাভ হতে লাগল। তখন সেই ঋণের স্বদ দেবার সময় এসেছে, কি ঋণ পরিশোধ করার সময় এসেছে। তখন হচ্ছে ইংলণ্ডের পাওনা, ভারতবর্ষের দেনা। ভারতবর্ষ এখন এই দেনা কি ভাবে শোধ করতে পারে? যে টাকা ইংলণ্ডের পাওনা হবে সেই টাকার সম মূল্যের এমন কিছু জিনিস যদি ভারতবর্ষের থাকে যা ইংলণ্ডের দরকার তাহলে ভারতবর্ষ সেই জিনিস ইংলণ্ডে পাঠিয়ে তাই দিয়ে ইংলণ্ডের পাওনা মেটাতে পারে। এক্ষেত্রে ইংলণ্ড যে জিনিস পেল তার প্রতিদানে তাকে জিনিস পাঠাতে হল না এবং ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে শুধু জিনিস লেনদেনের হিসেবে ইংলণ্ডের যে আমদানির আধিক্য হল এবং ভারতবর্ষের যে রপ্তানির আধিক্য হল তার কারণ হচ্ছে মূলধন চলাচল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রথম কথা যেমন জিনিস চলাচল, তার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মূলধন চলাচল। এ পর্যন্ত আমরা যতদূর অগ্রসর হয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে মূলধন চলাচল না থাকলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শুধুই জিনিস চলাচল থাকত, আর কিছু থাকত না। জিনিস চলাচল হবে কিনা সেটা নির্ভর করে আপেক্ষিক লাভের উপর, কিন্তু জিনিসের বদলে কতটা জিনিস যাবে তা খানিকটা নির্ভর করে মূলধন চলাচল আছে কিনা তার উপরে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের সম্পূর্ণ হিসাব পেতে হলে দুটির হিসেব চাই, Balance of Trade-এর সঙ্গে Balance of Payment এর পরিমাণও জানতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে অনেক সময় মূলধন চলাচল রাজনৈতিক কারণে ঘটে থাকে এবং এসব ক্ষেত্রে যখন পাওনা আদায় করা হয় তখন দেনদারের আপেক্ষিক

লাভ থাক আর নাই থাক তাকে জিনিস দিতে হয়। এগুলি অবশ্য অর্থনৈতিক শোষণ, কিন্তু এ রকম শোষণের উদাহরণ জগতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে মোটেই বিরল নয়।

মূলধন চলাচল ও তার ফল

বিভিন্ন দেশের মধ্যে নানা-কারণে মূলধন চলাচল হয়। তার মধ্যে অনেক সময় নিতান্ত অস্থায়ীভাবে মূলধন চলাচল হয়,—যেমন সাময়িক কিছু বেশি আমদানির দাম মেটাবার জন্য কিছু মূলধন বাইরে গেল। কিন্তু এরকম সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে ছাড়া স্থায়ীভাবে দীর্ঘকালের জন্যও মূলধন চলাচল নানা-কারণে ঘটে। মূলধন চলাচল বলতে প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের মূলধন চলাচলই বোঝা উচিত।

দাতা ও গ্রহীতা এবং দানের প্রকারভেদ নিয়ে ঋণদানের নানারকম প্রকার আছে, তার মধ্যে এইগুলি প্রধান: (১) বিদেশের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে অন্য দেশের ব্যক্তিগত মূলধন লগ্নি হতে পারে। যেমন, কলিকাতার ট্রাম কোম্পানি। (২) বিদেশী গবর্মেণ্টকে অন্য দেশের জনসাধারণ ঋণ দিতে পারে ঐ গবর্মেণ্টের ঋণপত্র কিনে। আমাদের অধুনাশোধিত স্টার্লিং ঋণ এই ধরনের ঋণের উদাহরণ। (৩) এক দেশের গবর্মেণ্ট অন্য দেশের গবর্মেণ্টকে ধার দিতে পারে। এ আজকাল প্রচুর হচ্ছে। (৪) এক দেশের গবর্মেণ্ট অন্য দেশের ব্যক্তিগত ব্যবসাতে মূলধন নিয়োগ করতে পারে। যেমন, সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানি একটা যৌথ প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তার বহু অংশপত্র ইংরেজ সরকার কিনেছিলেন। অন্যান্য গবর্মেণ্টেও এর অংশ কিনেছিলেন।

এই যে সমস্ত ঋণদান হয় তার মূলে সময়ে সময়ে রাজনৈতিক কারণ থাকলেও অপেক্ষাকৃত বেশি লাভের আশাই এরকম ঋণদানের প্রধান

কারণ। নিচের হিসাবটিতে দেখান হল, ইংলণ্ডের স্বদেশে নিযুক্ত মূলধন থেকে সাধারণত কি আয় হয়, 'কলোনি'গুলিতে লগ্নি মূলধন থেকে কি আয় হয় আর বিদেশে লগ্নিকৃত মূলধন থেকেই বা কি আয় হয়:

শতকরা আয়

বাঁধা স্থদের ঋণ :	স্বদেশ	কলোনি	বিদেশ
১৮৮৮	৪·৩৫	৩·৪৩	৫·৬১
১৯০১	৩·০০	৩·৪০	৫·৩৪
১৯০৬	৩·৩৭	৩·৮৫	৫·১৪
অন্য শেয়ার :			
১৯০৩-০৭	৩·৩৭	৬·২৫	৬·১৪

বিদেশে লগ্নি মূলধনের আয় স্বদেশের তুলনায় বেশি। গত শতাব্দীতে যখন ইংরেজ বণিকেরা ৩% বা ৪% আয়ে মূলধন অন্য সর্বত্র লগ্নি করছিলেন সেই সময় ভারত-সরকার এদেশের রেলপথগুলি হতে ৫% আয় গ্যারাণ্টি করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি মূলধনে এদেশে নানা রেল-কোম্পানি গড়ে উঠল।

এবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর মূলধন চলাচলের ফল কি দেখা যাক্। পূর্বেই বলেছি, মূলধন চলাচল হলেই জিনিস চলাচলের হেরফের ঘটে যায়, আমদানি ও রপ্তানির আধিক্যের সম্ভাবনা ঘটে। এই আধিক্য ঘটবে কিনা তা অনেক ব্যাপারের উপর নির্ভর করে। পূর্বে ঋণদানের পদ্ধতির কথাটাও সংক্ষেপে বলেছি। যেমন ইংলণ্ড ভারতকে ঋণ দেবে। এর প্রথম ধাপ হচ্ছে টাকাটা হস্তান্তর। ধরা যাক্, ইংলণ্ড এক লক্ষ স্টার্লিং ভারতবর্ষের নামে লিখে দিল। ভারতের দরকার হচ্ছে কলকব্জার। যদি ইংলণ্ডেই স্থবিধামত কলকব্জা পাওয়া গেল তাহলে

৩। Karl Iversen, *International Capital Movements* হতে গৃহীত।

ভারতবর্ষ সেই এক লক্ষ স্টার্লিং তখনি তখনি দিয়ে ইংলণ্ড থেকে কলকব্জা নিয়ে এল। তাহলে দ্বিতীয় ধাপে দেখা গেল ঋণদানটা টাকা থেকে জিনিসে রূপান্তরিত হয়ে গেল, অর্থাৎ ঋণদানের ফলে ইংলণ্ডের রপ্তানি বাড়ল ও ঋণগ্রহণের ফলে ভারতের বাড়ল আমদানি। অবশ্য সব ক্ষেত্রে ঋণটা জিনিসে রূপান্তরিত হবার সুযোগ পায় না। যেমন, যদি ইংলণ্ডের হাতে কলকব্জা না থাকত তা হলে ঐ এক লক্ষ স্টার্লিং নিয়ে ভারতবর্ষকে দৌড়তে হত কানাডা কি আমেরিকায় কলকব্জার সন্ধানে। তাহলে ইংলণ্ডদত্ত ঋণ কাঁচা টাকার আকারেই ইংলণ্ড থেকে বেরিয়ে যাবে, রপ্তানি বাড়বে কানাডা কি আমেরিকার। এই রকম অসুবিধা নিবারণ করবার জন্য অনেক সময় সর্ত করে দেওয়া হয় যে ঋণের টাকা হতে যে জিনিস কেনা হবে তা উত্তমর্ণ দেশটি থেকেই কিনতে হবে। অবশ্য এমন অনেক আন্তর্জাতিক দেয় থাকে যা কখনই ঐ ধরনের জিনিসে রূপান্তরিত হতে পারে না। যেমন, অনেক দেশের বড় আন্তর্জাতিক কারবার আছে কিন্তু যথেষ্ট জাহাজ নেই, তারা ইংলণ্ড কি নরওয়ের জাহাজে জিনিস পাঠায়। ইংলণ্ড কি নরওয়ে জাহাজভাড়া হিসাবে যে টাকা পায় সেটা কাঁচা টাকা আকারেই তাদের হাতে আসে, জিনিসে রূপান্তরিত হবার সুযোগ পায় না। কিন্তু তবু বলা যেতে পারে সাধারণত মূলধন চলাচল হলে জিনিস চলাচলও অনুরূপ কমে বাড়ে। ঋণদানের ফলে উত্তমর্ণের বাড়ল রপ্তানি, অধমর্ণের আমদানি।

কিন্তু এইখানে থামলে চলবে না। এ তো হল প্রথম অবস্থা। যখন সুদ দেবার সময় হবে বা টাকা ফেরত দেবার সময় হবে তখন আবার অবস্থাটা হবে উল্‌টো। সুতরাং তখন অধমর্ণের চাই রপ্তানির আধিক্য, আর উত্তমর্ণের সাধারণত থাকে আমদানির আধিক্য। ভারতবর্ষের যে সাধারণত রপ্তানির আধিক্য ও ইংলণ্ডের আমদানির আধিক্য থাকে

তার একটা কারণ এই-ই। সেইজন্য উত্তমর্ণ অধমর্ণ দেশগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়: (১) নবীন উত্তমর্ণ, (২) প্রবীণ উত্তমর্ণ, (৩) নবীন অধমর্ণ, (৪) প্রবীণ অধমর্ণ। যে সব দেশে প্রতি বছর বিদেশে লগ্নিকৃত মূলধনের পরিমাণ বিদেশ হতে প্রাপ্ত সুদের চেয়ে বেশি হয় সেগুলিকে নবীন উত্তমর্ণ বলা হয়, আর বাৎসরিক সুদের আয় প্রতিবছর লগ্নিকৃত মূলধনের পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে সেগুলিকে প্রবীণ উত্তমর্ণ বলা চলে। নবীন উত্তমর্ণদের সাধারণত রপ্তানির আধিক্য থাকে, প্রবীণ উত্তমর্ণদের থাকে আমদানির আধিক্য। অধমর্ণদের অবস্থা উত্তমর্ণদের ঠিক বিপরীত, সেইজন্য নবীন অধমর্ণদের সাধারণত থাকে আমদানির আধিক্য আর প্রবীণ অধমর্ণদের থাকে রপ্তানির আধিক্য। যেমন, ভারতবর্ষের রপ্তানির আধিক্য থাকে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক মূলধন-চলাচলের প্রভাব শুধু আন্তর্জাতিক জিনিস-চলাচলের পরিমাণের উপরই পড়ে তা নয়। মোট পরিমাণ ছাড়া জিনিস-বিনিময়ের হারের উপরও তার প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ কতটা জিনিস যাবে সেটাও যেমন খানিকটা নির্ভর করে মূলধন-চলাচলের উপর, তেমনই কি হারে জিনিস-বিনিময় হবে সেটাও মূলধন-চলাচলের উপর খানিকটা নির্ভর করে। ঋণদানের ফলে সাধারণত রপ্তানির আধিক্য বাড়ে। এইটে যদি সত্য হয় তাহলে বুঝতে হবে ঋণদান তখনই সম্ভব হতে পারে যখন রপ্তানি বাড়াবার সম্ভাবনা আছে। রপ্তানির আধিক্য আবার তখনই হতে পারে যখন রপ্তানিকারক দেশটির দামের পর্যায় অন্য দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিচু, অর্থাৎ অনেক জিনিসেই তার আপেক্ষিক লাভ থাকে। সুতরাং ঋণদানের, অর্থাৎ রপ্তানির আধিক্য হবার, ইঙ্গিত যদি এই হয় যে উত্তমর্ণ দেশের জিনিসগুলি পূর্বের তুলনায় সস্তা হয়ে গেল তাহলে নীট বিনিময়-হার তার বিপক্ষে যাবার সম্ভাবনা। আরও সোজা কথায়

ব্যাপারটা বলি। ইংলণ্ড পূর্বে এক লক্ষ কাপড়ের গাঁট দিয়ে ভারত হতে এক লক্ষ পাটের গাঁট আমদানি করত, তখন নীট বিনিময়-হার ছিল ১:১। এখন ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে ঋণ দেওয়ার ফলে ইংলণ্ড থেকে আরও জিনিস রপ্তানি হতে লাগল কিন্তু তার প্রতিদানে সে তখনই ভারত থেকে কিছু পেল না। তখন যদি দুই লক্ষ গাঁট দিয়ে ইংলণ্ড পূর্বের মতই এক লক্ষ ভারতীয় গাঁট পায় তাহলে ইংলণ্ডকেই দিতে হচ্ছে বেশি, বিনিময়-হার তার বিপক্ষে গিয়ে হয়ে দাঁড়াল ২:১। এখানেও অবশ্য কালক্রম ভাগ করা দরকার। মূলধন-চলাচলের ফলে বিনিময়-হার উত্তমর্ণের বিরুদ্ধে যাবার সম্ভাবনা এই কথাটি নবীন উত্তমর্ণদের বেলায় খাটে, প্রবীণ উত্তমর্ণদের বেলায় নয়, কারণ তখন তাদের খরচের চেয়ে জমার অঙ্ক বেশি।

কিন্তু শুধু যে জিনিস চলাচলের পরিমাণ ও জিনিস বিনিময়ের হারের উপরই মূলধন চলাচলের প্রভাব পড়ে তা নয়, তার প্রভাব আরও সুদূর-প্রসারী। তার প্রভাব মুদ্রাহারের উপরও পড়ে, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা আছে। তা ছাড়া তার প্রভাব উভয় দেশের সমস্ত দাম-পর্যায় ও আয়-পর্যায়ের উপর পড়ে, তার ফলে সমস্ত শিল্প-বাণিজ্যের কাঠামোও বদলে যাওয়া আশ্চর্য নয়। ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে ধার দিল রেলপথ বিস্তারের জন্য। ধরা যাক্, ভারতবর্ষ ঐ টাকা হতে রেলপথ বিস্তারের সরঞ্জাম (লাইন, ইঞ্জিন ইত্যাদি) ইংলণ্ড থেকেই কিনছে। সে সময় কিছুদিন ইংলণ্ড হতে খুব ইঞ্জিন ইত্যাদি রপ্তানি হতে লাগল। সে সময়ে রেলের সরঞ্জাম তৈরি করায় খুব লাভ হচ্ছে দেখে ইংলণ্ডে অন্য শিল্প থেকে শ্রম ও মূলধন প্রভৃতি রেল-সরঞ্জাম তৈরিতে নিযুক্ত হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে এইরকম চললে ইংলণ্ডের শিল্পের কাঠামোও বদলে যেতে পারে। ভারতবর্ষেও অনুরূপ বদল ঘটতে পারে। ধরা

যাক্‌, ঐ টাকা হতে রেলপথ বিস্তার হল, গ্রামে গ্রামে ব্যবসা বাড়ল, অনেক ব্যবসায়ীর হাতে পয়সা এল, তারা আবার ইংলণ্ড থেকে আরও নানারকম জিনিস আমদানি করতে লাগল। কি আরও একটা চরম উদাহরণ নেওয়া যাক্‌। টাকা ধার পেয়ে ভারতবর্ষ এখানেই রেলের সরঞ্জাম তৈরি করবার যন্ত্রপাতি আনাল। তা হলে ভারতবর্ষে রেল-পথসংক্রান্ত লোকদের আয় বাড়বে, তারা আবার নতুন নতুন জিনিস আমদানি করবে এ কথা সত্য, কিন্তু ইংলণ্ডে রেলের সরঞ্জাম তৈরির ব্যবসা শেষ পর্যন্ত আঘাত পাবে। এই কারণে উত্তমর্ণদের চেষ্টা থাকে যে টাকাটা এমনভাবে ধার দেওয়া হোক যাতে অধমর্ণদের স্থায়ী উন্নতি না হয়, তারা চিরকালই দেনদার থাকে ও সুদ দিয়ে যেতে থাকে। সেইজন্য আন্তর্জাতিক মূলধন-চলাচলের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রভুত্ব পাবার চেষ্টা থাকে। ফিন্যান্স-ক্যাপিটাল ও সাম্রাজ্যবাদ সেই কারণে নামান্তরমাত্র।

পরিশেষে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে পূর্বে মূলধন লেনদেনের যে ফলাফলগুলি বর্ণনা করা হল সেগুলি সাধারণত ঘটে থাকে বটে, কিন্তু তা বলে তা ঘটবেই এরকম কোনও অভ্রান্ত নিয়ম হতে পারে না। তার কারণ সবটাই নির্ভর করে চাহিদা-সরবরাহের অবস্থা ও দাম-পর্যায়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর। যেমন, বিনিময়-হার নবীন উত্তমর্ণদের বিরুদ্ধে গিয়ে থাকে এইটে সাধারণত সত্য। কিন্তু ধরা যাক্‌, ইংলণ্ডের যেসময় রপ্তানির আধিক্য বাড়ল সেসময় অধিক জিনিস একসঙ্গে তৈরি করার ফলে তার পড়তা কম পড়ল। তার উৎপাদন-খরচ যদি পূর্বের তুলনায় অর্ধেক হয়ে যায় তাহলে এখন এক লক্ষ গাঁটের বদলে দুলক্ষ গাঁট দিলেও আসলে তার লোকসান হবে না, কারণ দুলক্ষ গাঁটের উৎপাদন-খরচ পূর্বের এক লক্ষ গাঁটের উৎপাদন-খরচের চেয়ে বেশি নয়। সরবরাহের

অবস্থা বদল ঘটায় এখানে সাধারণ নিয়মটি খাটল না। শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটাই নির্ভর করে উভয়ের চাহিদা-সরবরাহ এবং দামপর্যায়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর। যেক্ষেত্রে তা ঘটে না (যেমন ভারতবর্ষকে 'হোম চার্জেস' দিতেই হবে, সুতরাং তার আপেক্ষিক লাভ থাক আর নাই থাক রপ্তানির আধিক্য বজায় রাখতেই হবে) সেখানে সেটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নয়, আন্তর্জাতিক শোষণ।

বাণিজ্যের খতিয়ান

এবার সব কটি জমাখরচ একত্র করে দেখা যেতে পারে আন্তর্জাতিক কারবার কিসে-কিসে হয়। ১৯২৮ সালের ইংলণ্ডের হিসাবটি দিচ্ছি :—

(League of Nationsএর *Memorandum on International Trade and Balance of Payments, 1926-28* দ্রষ্টব্য) :—

খরচ

১।	জিনিস ও কাঁচা সোনারূপা (বুলিয়ন) আমদানির আধিক্য···	—৩৫·৮ কোটি পাঃ
২।	লণ্ডন হতে সাগরপারে নতুন ঋণদান······	—১৪·৩ " "
	মোট	—৫০·১ কোটি পাঃ

জমা

১।	সাগরপার হতে সরকারের আনুমানিক নীট আয় ···	+১·৫ কোটি পাঃ
২।	জাহাজ হতে আয় ···	+১০·০ " "
৩।	বিদেশে লগ্নি মূলধন হতে আয় ···	+২৮·৫ " "
৪।	স্বল্পমেয়াদী ঋণ ও কমিশন হতে আয় ···	+৬·৫ " "
৫।	বিদেশ হতে অন্যান্য বিবিধ আয় ···	+১·৫ " "
	মোট	+৫১·০ কোটি পাঃ

দেখা যাচ্ছে, ইংলণ্ডকে খরচ করতে হয়েছে দুই কারণে—প্রথমত, আমদানির আধিক্যের দাম মেটাতে হয়েছে, দ্বিতীয়ত, নতুন ধার দেবার জন্য টাকা বার করতে হয়েছে। তার জমা অনেক দিক্ থেকে। সাগরপারে লগ্নি মূলধন প্রভৃতিতে তার সরকারের আয় হয়েছে দেড়কোটি পাউণ্ড, জাহাজভাড়া থেকে মোটা আয় হয়েছে, আরও নানা খাতে আয় হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মোট আয়ের অঙ্ক মোট ব্যয়ের অঙ্কের চেয়ে বেশিই হয়েছে। আবার সময়ে সময়ে ব্যয়ের অঙ্কই বেশি হয়ে যায়। তখন দেশের লোকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে, বা দেশের লোকের সঙ্গতি না থাকলে বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে, বা পূর্বে লগ্নি মূলধন ভেঙে-ভেঙে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের তাই করতে হচ্ছে।

তা হলে দেখা গেল, আন্তর্জাতিক লেনদেনের খতিয়ানে জিনিস-চলাচলই একমাত্র খাত নয়, যদিও সেইটিই আসল এবং প্রধান। এই কারণে জিনিস-চলাচলকে অনেকে দৃশ্য এবং বাকিগুলিকে অদৃশ্য খাত বলে থাকেন। সে যাই হোক্, আন্তর্জাতিক কারবারের খতিয়ান কষতে গেলে সব কটিরই আলোচনা করতে হবে, কারণ ওগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়।

মুদ্রা ও মুদ্রা-বিনিময় হার

এখন আর একটা বিপদের কথা উল্লেখ করতে হবে। বোঝা গেল যে জিনিসের বদলে জিনিসের চলাচল হয়, আপেক্ষিক লাভ না থাকলে তা হয় না; তা ছাড়া জিনিসের দাম সবটাই জিনিসে দেবার দরকার হয় না যদি মূলধন চলাচল ঘটে। কিন্তু জিনিসের দামের হিসাব কষা হয় কি ভাবে? দশটা রেলের ইঞ্জিন ভারতবর্ষে এসেছে,

তার বদলে ভারতবর্ষ পাট রপ্তানি করবে, কিন্তু কতটা পাট রপ্তানি করবে? এইখানেই মুদ্রার হিসাব দরকার হয়। দশটা ইঞ্জিনের দাম দেড়কোটি টাকা, সুতরাং দেড়কোটি টাকা দামের পাট পাঠাতে হবে এইভাবেই হিসাব কষতে হয়। আর মূলধনের হিসাবও তো টাকারই হিসাব। সুতরাং জিনিস-চলাচলই হোক আর মূলধন-চলাচলই হোক্ সবটারই হিসাব হয় মুদ্রার সাহায্যে। মুদ্রার মধ্যবর্তিতা ছাড়া এক পা অগ্রসর হবার উপায় নেই। চার-ঘোড়ার গাড়ি যখন নির্বিবাদে চলে তখন খুব চমৎকার, কিন্তু ঘোড়া চারটির প্রত্যেকটি যদি এক এক দিকে যেতে চায় তা হলে আরোহীর মনে হয় চার-ঘোড়ার চেয়ে এক ঘোড়াই ছিল ভাল। তেমনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রথ চলবার অনেকগুলি ঘোড়া। তার প্রথমটি হচ্ছে আপেক্ষিক লাভ, সেই ঘোড়াটাই প্রধান বাহন। তার সাহায্য করে মূলধন-চলাচল (যখন সাহায্য করে না, তখন উভয়েরই বিপদ)। তৃতীয় ঘোড়া হচ্ছে মুদ্রা। মুশ্‌কিল হয় এই যে, এই সব ঘোড়া সময়ে সময়ে বিগড়ে যায়, তখন রথটানার চেয়ে উন্মার্গগামিতাতেই তাদের আনন্দ বেশি হয়ে ওঠে। সেইজন্য মুদ্রার ব্যাপারটিও বোঝা দরকার।

পূর্বের উদাহরণটিই আবার নেওয়া যেতে পারে। দেড়কোটি টাকা দামের ইঞ্জিন ভারতবর্ষে এসেছে, দেড়কোটি টাকা দামের জিনিস ইংলণ্ডকে ফেরত দিতে হবে। ভারতবর্ষের মধ্যে সমস্ত জিনিসেরই দামের মাপকাঠি হচ্ছে টাকা, সুতরাং কোনও অসুবিধে হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের মুদ্রা আর ইংলণ্ডের মুদ্রা এক নয়, এখানে চলে টাকা, ওখানে চলে স্টার্লিং। সুতরাং ঐ দুটি মুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য ও বিনিময়-হার স্থির করবার দরকার হয়ে পড়ে। দেড়কোটি টাকা মানে কত পাউণ্ড স্টার্লিং? ইংলণ্ডের পাওনাদারদের তো টাকার হিসাব

নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই,—তারা বোঝে যে দশ লক্ষ পাউণ্ড দামের ইঞ্জিন পাঠিয়েছি, দশ লক্ষ পাউণ্ডের জিনিস ফেরত চাই। এখানে দুভাবে হিসাব কষা যেতে পারে। যখন জগতময় স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল (অর্থাৎ প্রত্যেক মুদ্রার বিনিময়ে কতটা সোনা পাওয়া যাবে তা আইনত স্থিরীকৃত ছিল) তখন ব্যাপারটা অনেক সহজ ছিল। এক পাউণ্ড স্টার্লিঙে এক আউন্স সোনা পাওয়া যায়, সেই এক আউন্স সোনার দাম ভারতবর্ষে পনরো টাকা। স্থতরাং এক পাউণ্ডের দাম পনরো টাকা এবং দশ লক্ষ পাউণ্ডের জিনিস হবে দেড়কোটি টাকার জিনিস, উভয়ের বিনিময়-হার হবে ১:১৫ এ কথা সহজেই বোঝা যায়। স্বদেশের মধ্যে মুদ্রাই যেমন সকল জিনিসের দামের মাপকাঠি (এক মণ চালের দাম **দশ টাকা,** দুজোড়া কাপড়ের দাম **দশ টাকা** ইত্যাদি) তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আবার মুদ্রার দামের মাপকাঠি ছিল সোনা (এক **পাউণ্ড স্টার্লিঙের** দাম এক আউন্স সোনা, পনরো **টাকার** দাম এক আউন্স সোনা, আবার চার **ডলারের** দাম এক আউন্স সোনা বা একশো **ফ্রাঁর** দাম এক আউন্স সোনা ইত্যাদি)। এখন আর জগতময় স্বর্ণমান প্রচলিত নেই, স্থতরাং বিভিন্ন মুদ্রার মূল্যের মাপকাঠি হিসাবে সোনাকে আর ধরা যায় না। সেইজন্য দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার এখন অনেকটা আন্দাজি ঠিক করতে হয়। অবশ্য এখানেও সম্পূর্ণ আন্দাজি ঠিক করা হয় না, এখানেও একটা মাপকাঠি আছে। সোনার সাহায্য পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু যদি দেখা যায় এক মণ গমের দাম বিলাতে এক পাউণ্ড স্টার্লিং অথচ এক পাউণ্ড স্টার্লিঙে পনরো মণ গম ভারতবর্ষে পাওয়া যায় যার দাম ভারতবর্ষে পনরো টাকা তাহলে তখনই বুঝতে পারা যাবে যে এক পাউণ্ড স্টার্লিঙের দাম হচ্ছে টাকার পনরো গুণ এবং বিনিময়-হার হওয়া উচিত ১:১৫। এখানে মাপকাঠি হচ্ছে সোনা নয়, মাপকাঠি হচ্ছে

মুদ্রার উভয়ত্র ক্রয়শক্তি। যে বিনিময়-হারে মুদ্রার স্বদেশে ও বিদেশে ক্রয়শক্তির সমতা ঘটে (Purchasing Power Parity) সেইখানেই ভারসাম্য হবে, অর্থনৈতিক গোলমাল দেখা দেবে না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আপেক্ষিক লাভের হিসাব কষে দেখা গেল যে সময় স্টার্লিং-টাকার বিনিময়-হার ১:১৫ সে সময় দশটা ইঞ্জিনের বদলে এক লক্ষ গাঁট পাট ভারতবর্ষ থেকে যাওয়া উচিত, এবং সেই ভাবেই লেনদেন চলছে। ইতিমধ্যে কোনও কারণে পাটের দাম দ্বিগুণ হয়ে গেল, এক লক্ষ গাঁট পাটের দাম ভারতবর্ষে দেড়কোটির জায়গায় তিন কোটি হয়ে গেল। সে সময়েও যদি বিনিময়-হার ১:১৫ থাকে তাহলে ভারতীয় পাট-শিল্পের ভয়ানক লোকসান হবে; কারণ তাদের প্রকৃতপক্ষে অর্ধেক দামে জিনিস দিতে হচ্ছে। তাদের লোকসান হলে তারা মজুরির হার কমাবার চেষ্টা করতে পারে (তাতে মজুরদের কষ্ট), কিছু কিছু মজুর ছাড়িয়ে দিতে পারে (তাতে বেকারসমস্যা বাড়বে) আর এ সব কিছুই সম্ভব না হলে লোকসান দিয়ে ব্যবসা চালানর বদলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া শ্রেয়ঃ মনে করবে (তাতে মন্দা শুরু হতে পারে)। এইভাবে নানা গোলমাল শুরু হবে। কিন্তু যদি তখন বিনিময়-হার ১:৭½ করে দেওয়া হয় তাহলে আর কোনও গোলমাল রইল না। পূর্বে টাকার (এবং পাউণ্ডেরও) স্বদেশী ও বিদেশী ক্রয়শক্তির যে সমতা ছিল এখনও তাই রইল। এইটিই সংক্ষেপে ক্রয়শক্তি-সমতার তত্ত্ব (Purchasing Power Parity Theory)।

এই হতে একটি কথা স্বতঃই মনে হয়। পূর্বে সেকালের অনেকটা স্বয়ংক্রিয় স্বর্ণমান কি ভাবে কাজ করত তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তা হতে বোঝা যায় যে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকলে যখনই দুটি মুদ্রার মধ্যে ক্রয়শক্তির সমতার অভাব ঘটেছে (অর্থাৎ যখনই দাম-পর্যায় ভারসাম্য

হারিয়েছে) তখনই সোনা চলাচল হতে আরম্ভ হয়েছে, বিপদের নিশানা পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু যখন এই রকম নিশানা থাকে না তখন দেশের কর্তৃপক্ষকে সবসময়েই সাবধান থাকতে হয়,—কোন সময়ে দেশের মুদ্রা অন্য কোনো দেশের সঙ্গে ভারসাম্যচ্যুত হল তখনই সেই দেশের সঙ্গে মুদ্রা-বিনিময়-হার দরকারমত বদল করে নিতে হবে। সুতরাং গোলমাল দূর করবার জন্য বা গোলমাল হবে এই আশঙ্কায় মুদ্রা-বিনিময়-হার বদল করা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কিন্তু জগতের মুশ্‌কিলই হচ্ছে এই যে, যে অস্ত্র আর্তত্রাণেই নিযুক্ত থাকা উচিত তাকে বেশি ব্যবহার করা হয় আর্তত্রাণের জন্য নয়, নিরপরাধ লোকদের প্রহার করবার জন্য। তেমনি, আন্তর্জাতিক কারবার সহজ করবার জন্যই যে সেখানে মুদ্রার জন্ম এবং আন্তর্জাতিক গোলমাল দূর করবার জন্য মুদ্রা-বিনিময়-হারের যে অদলবদল সে কথাটাই এখন আর সবটা নয়। আমরা এই উপায়টিকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেও শিখেছি। ধরা যাক্, ইংলণ্ড ও জার্মানির মধ্যে ক্রয়শক্তির সমতা আছে, সেসময় বিনিময়-হার হচ্ছে ১ পাউণ্ড স্টার্লিং = ৪০ মার্ক। এ সময় আপেক্ষিক লাভের হিসাব কষে দেখা গেল এক পাউণ্ড দামের কুড়িটি ঘড়ি (অর্থাৎ মোট কুড়ি পাউণ্ড স্টার্লিং দামের জিনিস) নিয়ে জার্মানি দুই মার্ক দামের কুড়িটি চশমার কাঁচ পাঠাচ্ছে, তাতে ভারসাম্য বজায় আছে। এখন জিনিস তৈরি খরচ বা অন্য কোনও কিছুরই বদল হল না অথচ জার্মান-সরকার হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে অতঃপর প্রতি পাউণ্ড স্টার্লিঙে আশি মার্ক পাওয়া যাবে ও বিনিময়-হার হল ১: ৪০ নয়, ১:৮০। এখন তা হলে কি হবে? জার্মানিতে কুড়িটি চশমার কাঁচ তৈরি করতে পূর্বের মতই চল্লিশ মার্ক খরচ পড়ছে, অথচ তার দাম ইংলণ্ডে তখন আধ পাউণ্ড স্টার্লিং মাত্র। সুতরাং নিজেদের এক পাউণ্ড স্টার্লিং জিনিস বিক্রি

করবার জন্ত (অর্থাৎ পূর্বের মত কুড়িটি ঘড়ি বিক্রি করবার জন্য) ইংলণ্ডকে এখন কুড়িটির বদলে চল্লিশটি কাঁচ কিনতে হবে। ফল দাঁড়াল এই যে বিনিময়-হার হঠাৎ বদল করে ইংলণ্ডের বাজারে (কিন্তু শুধু ইংলণ্ডের বাজারে, নিজের দেশে নয়) জার্মান জিনিস সস্তা হয়ে গেল, জার্মান জিনিসে পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ লাভ হল, জার্মান শিল্পের বিক্রি দ্বিগুণ হল। এরই নাম হঠাৎ মুদ্রামূল্য কমানো (Exchange Depreciation)। বহির্বাণিজ্য, বিশেষতঃ রপ্তানি, বাড়াবার জন্য এই কৌশলটা আজকাল প্রায়ই ব্যবহার হয়। অবশ্য এ কৌশলও বেশি দিন চলে না। পূর্বের উদাহরণে জার্মাণ তার মুদ্রামূল্য কমাবার সঙ্গে সঙ্গে যদি ইংলণ্ডও তার মুদ্রামূল্য কমিয়ে দেয় তাহলে উভয় দেশেই কাটাকাটি হয়ে গেল; বা ইংলণ্ড যদি জার্মান কাঁচের উপর শতকরা ১০০ ভাগ শুল্ক বসিয়ে ইংলণ্ডের বাজারে জার্মানির কাঁচের দাম পূর্বের মতই রাখে তাহলেও জার্মানির মুদ্রামূল্য কমানো নিষ্ফল হল; বা ইংলণ্ডের তরফ থেকে যদি কিছু না-ও হয় তা হলেও এমন হতে পারে যে কাঁচের ব্যবসাতে লাভ হচ্ছে দেখে জার্মান মজুরেরা ধর্মঘট করে মজুরির হার চড়িয়ে নিল এবং তার ফলে যে লাভটুকু হচ্ছিল তা উড়ে গিয়ে কাঁচের দাম জার্মানির বাজারেও দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াল—তাহলে তার মুদ্রামূল্য কমানো তখন অর্থহীন হয়ে গেল। বা, যদি জার্মানির কাঁচশিল্প এমন একটি বিশেষজ্ঞদের শিল্প হয় যে তাতে বেশি উৎপাদন করলে পড়তা কমে না বরং বাড়ে তাহলে রপ্তানির পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-খরচও বেড়ে যাবে। আসল কথা, হঠাৎ মুদ্রামূল্য কমিয়ে দিয়ে অন্য সব জিনিস বজায় থাকতে থাকতে একই জিনিসের স্বদেশী ও বিদেশী বাজারে দামের তফাত ঘটিয়ে দিয়ে কিছুকাল লাভ করা যেতে পারে বটে, কিন্তু যে দিক থেকেই হোক সেই তফাতটা ঘুচে গেলেই সে লাভ থাকবে না।

তবুও অর্থনৈতিক অস্ত্র হিসাবে এই অস্ত্রটি আজকাল প্রায়ই ব্যবহার হয়ে থাকে এবং অনেক সময় অনেক দিন সফলও হয়ে থাকে, তার কারণ জটিলতা বাড়ার ফলে উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ আজকাল এমন অনড় ও অপরিবর্তনীয় যে ঐ তফাতটা ঘুচতে অনেক দেরি হয়।

সুতরাং আপেক্ষিক লাভের নীতি এবং মূলধন চলাচলের পরিমাণ যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ামক, মুদ্রাহারও তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক নয়। মুদ্রামূল্য কমাবার যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে যদিও আপেক্ষিক লাভের কিছুই বদল হয় নি, মূলধনও চলাচল হয় নি, তবুও জার্মানির রপ্তানি যে বেড়ে গেল তার কারণ মুদ্রাহারের অদলবদল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঠিক চলছে কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে জিনিস চলাচল ও মূলধন চলাচল ঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা সে কথাও যেমন বিবেচ্য মুদ্রাহার বি-সম অবস্থায় আছে কিনা সেকথাও তেমনি বিবেচ্য। কোন একটি মুদ্রাহার সমতায় আছে কি বি-সম অবস্থায় আছে তা বুঝতে হলে দেখা দরকার ঐ মুদ্রাহারটি বর্তমান থাকা কালে দেশের মধ্যে উৎপাদনের দাম ও খরচের সাম্য হয়েছে কিনা—জিনিস তৈরির যা খরচ তা জিনিসগুলির বর্তমান দামে ঠিক পুষিয়ে যাচ্ছে কি না। তা না হলেই বুঝতে হবে অন্তত স্বদেশের তরফ থেকে বিচলিত হবার কারণ ঘটেছে, মুদ্রাহারের ফলে দেশী শিল্পের দাম ও খরচের ভারসাম্য নেই। মুদ্রার স্বদেশে ক্রয়শক্তি ও বিদেশে ক্রয়শক্তির সমতা নেই।

দ্রব্যমূল্য, না মুদ্রামূল্য ?

এখানে একটি সমস্যা উঠে পড়ে। দেখা যাচ্ছে, কোন সময় যে কোন কারণেই হোক ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের মুদ্রাহার ঘন ঘন বদল

না করলে ক্রয়শক্তির সমতা থাকছে না। ধরা যাক্, ইংলণ্ডের মুদ্রা-বিভ্রাট্ বা রাজনৈতিক কারণে এরকম ঘটছে। সেখানে মুদ্রাহার ঘন ঘন বদল না করলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের লোকসান হ'তে পারে, কিন্তু মুদ্রাহার ঘন ঘন বদল করলে দেশের মধ্যেও দামের এমন ওঠাপড়া হবে যে তাতেও দেশের লোক ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। এখানে কি কর্তব্য? মুদ্রার দাম স্থির রাখা (তাহলে বিনিময়-হার বদল হবে এবং জিনিসের দাম উঠবে-পড়বে), না জিনিসের দাম স্থির রাখা (তা হ'লে মুদ্রার দাম উঠবে-পড়বে)? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে জানা দরকার প্রশ্নাধীন দেশটিতে বহির্বাণিজ্যের গুরুত্ব কতটা। যদি দেখা যায় দেশটির বহির্বাণিজ্য নগণ্য তাহলে জিনিসের দাম (অর্থাৎ স্বদেশে জিনিসের দাম) স্থির রাখাই ভাল, তাতে মুদ্রার মূল্য (অর্থাৎ ঐ সব জিনিসেরই বিদেশী বাজারে দাম) যাই হোক। অবশ্য যদি এমন একটা মুদ্রাহার স্থির রাখতে পারা যায় যাতে উভয় দিকই রক্ষা পায় তাহলে এই সমস্যাটির আদর্শ সমাধান হয়, কোনও দিকেই লোকসান সহ্য করতে হয় না।

যাতে বাইরের মুদ্রাজনিত গোলমাল অকারণে স্বদেশের উপর আঘাত না করতে পারে তার জন্য নানারকম কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে, তার মধ্যে মুদ্রা-বিনিময়-হার সমীকরণ ভাণ্ডার (Exchange Equalisation Account) অন্যতম। ব্যাপারটি মোটামুটি এই রকম:—বিনিময়-হারের ওঠাপড়া বন্ধ করবার জন্য একটি ভাণ্ডার থাকে, দরকার মত সেই ভাণ্ডার হ'তে টাকা দিয়ে বা টাকা নিয়ে বিনিময়-হারের ওঠাপড়া বন্ধ করা হয়। ১৯৩২ সালে ইংলণ্ডে প্রথম এই ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। পরে প্রায় সর্বত্রই হয়েছে।

কিন্তু এত করেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। যদি বিশেষ মৌলিক

গোলমাল থাকে তাহলে এত রক্ষাকবচেও কিছু ফল হয় না। যেমন, যদি কোনও দেশ আপেক্ষিক লাভ না থাকা সত্ত্বেও ব্যবসা করতে বাধ্য হয় তাহলে তার কুফল মুদ্রাহারের পতনের কারণ হবেই, মুদ্রাহার যতই রক্ষাকবচ দিয়ে বাঁধা হোক না কেন। সেইজন্য আংশিক নিয়ন্ত্রণ অনেক সময় অর্থহীন। একদিক সামলাতে গিয়ে অপর দিকে গোলমাল শুরু হয়। এই কারণে একসঙ্গে সবদিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে জিনিস চলাচল আপেক্ষিক লাভের নীতিতে হতে পারে, তার স্বাভাবিক পথ বিকৃত না হয়। সেই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে মূলধন চলাচলের এবং মুদ্রাহারের, যাতে এদিকের গোলমালে আসল দিকে ক্ষতি না হয়। এই সব নিয়ন্ত্রণ-কৌশলের মধ্যে শুল্কব্যবস্থা প্রাচীনতম। এই সম্বন্ধে আলোচনা করে অপরাপর নিয়ন্ত্রণ-কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

শুল্ক ও তার ভিন্ন রূপ

কোনও দেশে কোনও জিনিস প্রবেশ করার সময় সাধারণত কিছু শুল্ক লাগে। জিনিস রপ্তানি করতে হলেও অনেক সময় বেশ মোটা শুল্ক লাগে, তবে আমদানির উপর শুল্ক যতটা প্রচলিত রপ্তানির উপর শুল্ক ততটা নয়। এই রকম শুল্ক বসানর উদ্দেশ্য কি? এর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে জিনিস চলাচল হতে কিছু রাজস্ব পাওয়া—এর নাম রাজস্বশুল্ক। সাধারণত এই ধরনের শুল্কের হার খুব চড়া হয় না। তা ছাড়া আর এক ধরনের শুল্ক আছে—সংরক্ষণ-শুল্ক। বৈদেশিক জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় স্বদেশী জিনিস যদি না পেরে ওঠে তাহলে বিদেশী জিনিসের উপর খুব চড়াহারে আমদানি-শুল্ক বসিয়ে দেওয়া হয় যাতে সে দেশের মধ্যে বাইরের জিনিসগুলির দাম চড়ে যায়। তা ছাড়া সম্প্রতি শুল্কহারের মারফত আরও একটি উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা হচ্ছে। শুল্কহারের সাহায্যে

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও গতি নিয়ন্ত্রণ করে দেশের জিনিস চলাচলের, মূলধন-চলাচলের বা মুদ্রাহারের গোলমাল ও নিবারণ করার চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য শুধু শুল্কহার বদল করেই এত বড় উদ্দেশ্যটা সাধিত হওয়া কঠিন, তার জন্য সেই সঙ্গে শুল্কচুক্তি প্রভৃতি আরও নানা কৌশলের দরকার সাধারণত হয়ে থাকে। কিন্তু এই সব কলা-কৌশলের মধ্যে শুল্কনীতির হেরফের অন্যতম কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই তৃতীয় উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য শুল্ককে যে নানা বিচিত্ররূপ নিতে হয়েছে সে কথা আপাতত বাদ দিলে শুল্কের প্রধান প্রধান রূপ এইগুলি: (১) শুল্ক বসতে পারে দেশের এক অংশ থেকে আর এক অংশে জিনিস চলাচলের উপর, বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে জিনিস যাবার সময় আসবার সময়। আভ্যন্তরীণ শুল্ক এখন আর প্রায় কোথাও নেই। (২) দেশান্তর হবার সময়ের শুল্ক দুরকম হতে পারে, আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি শুল্ক। (৩) আমদানি শুল্কের তিনটি বড় বিভাগ: (ক) শুল্কটি স্বতোনির্ভর, না অন্য দেশের সঙ্গে সে সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতা আছে; (খ) শুল্কের হার কি। অর্থাৎ, সব জিনিসের উপরই সমান হার, না বিভিন্ন জিনিসের উপর বিভিন্ন হার? যদি বিভিন্ন হার হয় তবে সেই হার আমদানির জিনিস হিসাবে বিভিন্ন, না, আমদানির দেশ হিসাবে বিভিন্ন? অনেক সময় কতকগুলি জিনিস আমরা আমদানি করতে চাই, কতকগুলি চাই না। সে সময় অবাঞ্ছনীয় জিনিসগুলির উপর চড়াহারে শুল্ক বসান হয়। আবার অনেক সময় কোনও একটা দেশের সঙ্গে অন্য একটা দেশের ঝগড়া হতে পারে, সে সময় চড়া হারে শুল্ক বসান হয় সেই বিবদমান দেশের জিনিসের উপর। যুদ্ধের সময় এ রকম পক্ষপাত-মূলক শুল্ক প্রায়ই প্রবর্তিত হয়; (গ) আমদানি-শুল্ক উদ্দেশ্যভেদে আবার দুরকম হতে পারে: রাজস্ব-শুল্ক ও সংরক্ষণ-শুল্ক।

তা ছাড়া শুল্কের আরও একটা বিভাগ করা চলে। জিনিসের দামের উপর যে শুল্ক বসান হয় তার নাম মূল্যশুল্ক (Ad Valorem Duty)। যেমন, প্রতি ১০০৲ টাকা দামের লোহা আমদানিতে ১০৲ টাকা শুল্ক দিতে হবে। যদি জিনিসের পরিমাণের উপর শুল্ক বসান হয় তাহলে সেটা পরিমাণ-শুল্ক (Specific Duty)। যেমন, প্রতি টন লোহা আমদানি করতে হলে দশ টাকা শুল্ক দিতে হবে—এটা হল পরিমাণ-শুল্ক।

শুল্কের ফলাফল

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর শুল্কের ফলাফল কি ? সহজবুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে শুল্কহার আপেক্ষিক লাভের নিয়মের সচ্ছন্দ কাজে বাধা দেয়। আপেক্ষিক লাভের হিসাবে লাভ থাকায় জাভা ভারতবর্ষে চিনি পাঠাত। ভারতবর্ষে জাভা-চিনির উপর চড়া শুল্ক বসান হল। তার ফলে ভারতীয় বাজারে জাভা-চিনির দর বেড়ে গেল, আপেক্ষিক লাভ থাকা সত্ত্বেও অবস্থা দাঁড়াল যেন আপেক্ষিক লাভ নেই। এই হল শুল্কের প্রথম ফল। অবশ্য এই কথাটি আপাতত সত্য মনে হলেও অবস্থাবিশেষে সত্য না-ও হতে পারে। অবাধ ভাবে চলতে থাকলেই যে বাণিজ্য সব সময়ে সকলের আপেক্ষিক লাভের সহায়ক হয় তা বস্তুত হয় না। সেক্ষেত্রে শুল্ক বসালেই সকলের আপেক্ষিক লাভ বজায় থাকে বেশি। যাই হোক, যদি এমন হয় যে কোনও রকম বাধা না পেলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আপেক্ষিক লাভের নীতি সকলের পক্ষে পূর্ণমাত্রায় ফলবে এবং সমস্ত সংশ্লিষ্ট দেশের আপেক্ষিক লাভ হবে সর্বাপেক্ষা বেশি, তাহলে স্বীকার করতে হবে শুল্ক বসালেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের

স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হয়। কিন্তু আবার মনে করতে হবে 'থিওরি'তে উপরিউক্ত কথা সত্য হলেও এরকম ব্যাপার বস্তুত প্রায়ই ঘটে না।

এইটি হচ্ছে শুল্ক বসানর বড় ফল। তা ছাড়া আরও দু-চারটি ফল আছে। যে জিনিসটির উপর শুল্ক বসান হয় তার চাহিদা ও সরবরাহের উপর তার প্রভাব স্বতই পড়বে। এর চাহিদা কতটা কমবে এবং সংরক্ষিত জিনিসটির কতটা স্বদেশে উৎপন্ন হবে এটি নির্ভর করে চাহিদার তীব্রতা এবং উৎপাদনের সুবিধার উপর। জাভা-চিনি ভারতবর্ষে বন্ধ হওয়ায় চিনির দর চড়ে গেল। এখন, ভারতবর্ষে যদি চিনির চাহিদা খুব তীব্র না হয়, একটা শ্রেণী যদি দর চড়বার সঙ্গে সঙ্গে চিনির বদলে গুড় খেতে আরম্ভ করে তাহলে ভারতবর্ষে চিনির চাহিদা আগের চেয়ে কিছু কমে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। কিন্তু ধরা যাক্, ভারতবর্ষে যথেষ্ট মূলধন ও শ্রম বিনা কাজে পড়ে আছে। যদি সস্তায় সেগুলিকে পাওয়া যায় তাহলে হয়ত উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় চিনির দাম জাভা-চিনির মত সস্তা না হলেও আগে ভারতীয় চিনিরই যা দাম ছিল তার চেয়ে সস্তা হল। তার ফলে চিনির চাহিদা আবার কিছু বাড়তে পারে। সুতরাং শুল্কের একটা প্রভাব পড়ে দেশের চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থার উপরে। এর মধ্য দিয়ে শুল্কের প্রভাব দ্বিতীয়ত পড়ে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর। সংরক্ষণের ফলে দেশের আন্তঃশিল্প থেকে বেশি লাভ হতে থাকলে মূলধন, শ্রম প্রভৃতি ক্রমশ রপ্তানিশিল্প হতে আন্তঃশিল্পের দিকেই বেশি ঝোঁকে, সেইজন্য অনেক সময় দেশের রপ্তানি এবং রপ্তানির ক্ষমতা কমে যায়। শুল্কের একটা ফল সেই কারণে এই যে, তা ক্রমশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ কমায়, শুধু যে জিনিসটির উপর শুল্ক বসান হয় সেইটিরই রপ্তানি (এবং সংরক্ষিত দেশে, আমদানি) কমে তাই নয়, শ্রম ও মূলধন

প্রভৃতি উৎপাদকগুলি উভয় দেশেই আন্তঃশিল্পে [illegible] আসায় মোটের উপরও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমবার সম্ভাবনা।

অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকেরা শুল্কের আরও দু-একটি [illegible] দেখাবার চেষ্টা করেন। একটা যুক্তি হচ্ছে, শুল্ক বসালে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। কথাটা খানিকটা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। দাম শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থার উপর। শুল্ক বসলেই চাহিদা-সরবরাহের এমন বদল ঘটবে যে দাম হু হু করে চড়ে যাবেই তা বলা যায় না। কিন্তু যদি দাম কিছু চড়েও তাহলেও লাভলোকসানের হিসাব করতে হবে জাতীয় আয়ের দিক থেকে। যদি শুল্কের ফলে মোট জাতীয় আয় বাড়ে এবং সেটিকে সুষ্ঠুভাবে পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থাও সেই সঙ্গে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত লাভই হবে। অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকেরা আরও বলেন যে, অবাধ বাণিজ্য চলতে থাকলে একচেটে ব্যবসার সুবিধা হয় না। কিন্তু এ একথাটিও সত্য নয়, কারণ একচেটে ব্যবসার কারণ আছে অনেকগুলি এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়া ব্যবসারও উদাহরণ কম নেই, যা নিবারণ করার সাধ্য অবাধ বাণিজ্যেরও হয় না।

শুল্কের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

শুল্কের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি বিচার করবার আগে প্রশ্ন ওঠে এই যুক্তিগুলির ভাল-মন্দ বিচার করবার মাপকাঠি কি? আসলে আমাদের অর্থনৈতিক নীতির উদ্দেশ্য কি সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে এ বিচার চলে না। যে দেশ মনে করে জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখবার জন্য, বা অন্য কোন কারণে, তার সব জিনিসই স্বদেশে তৈরি করতে হবে তাকে আপেক্ষিক লাভের কথা বলতে যাওয়া বৃথা—তার পক্ষে সর্বগ্রাসী সংরক্ষণ-নীতিই একমাত্র নীতি। বর্তমান আলোচনায়

আমরা ধরে নিচ্ছি যে দেশের জাতীয় আয় সবচেয়ে বাড়ান এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই আয়ের সুষ্ঠুতম বণ্টন-ব্যবস্থা করাই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য। এই দিক থেকে এইবার যুক্তিগুলি বিচার করা যেতে পারে।

পূর্বেই বলেছি যে যদি বিশ্বাস করা যায় যে কোনও রকম বাধা না পেলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আপেক্ষিক লাভের নীতি পূর্ণমাত্রায় ফলবে এবং সমস্ত সংশ্লিষ্ট দেশের সবচেয়ে বেশি আপেক্ষিক লাভ হবে, তা হলে শুল্কের, বিশেষ করে সংরক্ষণ-শুল্কের, সমর্থন করা কঠিন হয়ে ওঠে। বাস্তবিকপক্ষে তত্ত্বের দিক্ থেকে অবাধ বাণিজ্যের স্বপক্ষে যদি কোনও প্রকৃত যুক্তি থাকে তো এইটিই আছে। কিন্তু তত্ত্ব যাই হোক তথ্য আলোচনা করলে দেখা যায় এরকম অবস্থা কাজের বেলায় প্রায় ঘটে না। যেমন, কোনও দেশের কোনও একটা জিনিস উৎপাদনে আপেক্ষিক লাভের সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট, কিন্তু গোড়ার দিকে তাকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে না বাঁচালে সেই সম্ভাবনা কোন দিনই কাজে ফলবে না। এক্ষেত্রে যদি সংরক্ষণ-শুল্ক বসিয়ে গোড়ার দিকে প্রতিযোগিতা বন্ধ করা যায় তাহলে প্রকৃতপক্ষে আপেক্ষিক লাভের নীতির সহায়তাই করা হল।

সংরক্ষণের স্বপক্ষের যুক্তিগুলিকে এই দিক্ থেকে দুভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমত, অনেক সময় কতকগুলি সাময়িক কারণে আন্তর্জাতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়, আপেক্ষিক লাভের নীতি ব্যাহত হয়। শুল্কের সাহায্যে এইসব কারণ দূর করা যায়, এই বিশ্বাস হতে সংরক্ষণের স্বপক্ষে অনেকগুলি যুক্তির উদ্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দেখা যায়, আন্তর্জাতিক ভারসাম্য আপাতত ঠিক থাকলেও জাতীয় উন্নতির জন্য পরিণামে নতুন ভারসাম্যের দরকার হয়। এই হতে দ্বিতীয় ধরনের যুক্তিগুলির উদ্ভব। প্রথমে, শুল্কনীতি সাময়িক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবার সহায়ক কি ভাবে কতদূর হতে পারে সেই কথা আলোচ্য:

(ক) জিনিস বিনিময়ের হারের উন্নতি। যদি নীট বিনিময়-হার কোন ও দেশের বিরুদ্ধে যেতে আরম্ভ করে তাহলে শুল্ক বসালে সেটা বন্ধ হতে পারে, এমন কি হারের উন্নতিও হতে পারে। রপ্তানি না কমে যদি আমদানি কমে তাহলে বিনিময়-হারের উন্নতির খানিকটা সম্ভাবনা আছে সত্য; কিন্তু এ কথাটা অভ্রান্ত সত্য নয়, কেননা আমদানি কমবার সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানিও কমতে পারে, আর তা ছাড়া বিনিময়-হার আসলে নির্ভর করে পরস্পরের চাহিদা সরবরাহের অবস্থা এবং বিভিন্ন দাম পর্যায়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর।

(খ) আমদানি-রপ্তানির সাম্য বজায়। যে সময় আমদানি ও রপ্তানির সাম্য বজায় থাকছে না, ফলে টাকার চলাচল হচ্ছে, সে সময় শুল্ক সেই সাম্য ফিরিয়ে আনতে পারে কি? ধরা যাক্, আমদানির আধিক্য হয়েই চলেছে, ফলে বহু টাকা দেশ থেকে দিতে হচ্ছে। এ সময় আমদানি শুল্ক বসিয়ে আমদানি কমাতে পারলে সমতা ফিরবে কি? বিখ্যাত পণ্ডিত কেন্‌স্ এককালে বিশ্বাস করতেন যে এই উপায়ে সমতা ফিরবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে সে কথা সব সময়ে সত্য হয় না। কোন সময়ে কিছু উপকার হতে পারে।

(গ) বেকার-সমস্যার সমাধান। শুল্কের সাহায্যে দেশের বেকার-সমস্যা সমাধানের সহায়তা হয় কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে জানা দরকার, বেকার-সমস্যাটির স্বরূপ কি। কখনও কখনও সাময়িক বেকার-সমস্যা দেখা দেয়, কোনও বেকার-সমস্যা আবার মন্দার সঙ্গে জড়িত; কোনও সময়ে হয়তো কোনও একটি বিশেষ শিল্পেই বেকার-সমস্যা সীমাবদ্ধ থাকে, কোনও সময় তা বহুবিস্তৃত। শুল্কের প্রভাব সবক্ষেত্রে এক নয়। এ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। মোটামুটি বলা যেতে পারে, শুল্কের সাহায্যে কোনও একটা শিল্পের বেকার-সমস্যা দূরীভূত যদি বা হয় তার

দ্বারা সর্বগ্রাসী বেকার-সমস্যার সমাধান হয় না। উপরন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে মজুরির হার চড়িয়ে দিয়ে তা সাধারণ রপ্তানির ক্ষতিকরই হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য সবক্ষেত্রে একথাও প্রযোজ্য নয়। যে ক্ষেত্রে শ্রম বা মূলধন পূর্ব হতে যথেষ্ট বাড়তি আছে সেক্ষেত্রে সংরক্ষণনীতির সাহায্যে মোট শিল্পের বিস্তার হলে মোট বেকার-সমস্যার হয়তো কিছু সমাধান হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সবটিই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছে ঐ চাহিদা সরবরাহের অবস্থার উপর।

সুতরাং মানতে হবে যেখানে অবস্থা সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং কোথাও একটি পরিবর্তন হলেই সর্বত্র হাজার রকম পরিবর্তন শুরু হয়ে যায় সেখানে অবস্থা-নিরপেক্ষ উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ অব্যয় সত্য বলে কিছু নেই। এ ধরনের অব্যয় সত্য শুল্কের স্বপক্ষের যুক্তিতেও নেই, বিপক্ষের যুক্তিতেও নেই। সবটাই নির্ভর করে উদ্দেশ্যের উপরে, অবস্থার উপরে।

শুল্কের স্বপক্ষে দ্বিতীয় ধরনের যুক্তিগুলি সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। দ্বিতীয় ধরনের যুক্তিগুলির মধ্যে শিশুশিল্প-সংরক্ষণ যুক্তিটিই প্রধান। আপেক্ষিক লাভের সম্ভাবনা আছে, অথচ গোড়ার দিকে একটু সংরক্ষণ ও সাহায্য না দিলে সে সম্ভাবনা কোনদিনই কাজে পরিণত হবে না, এরকম ক্ষেত্রে সংরক্ষণ দেওয়াকেই শিশুশিল্প-সংরক্ষণ বলা হয়। সেইজন্য শিশুশিল্প-সংরক্ষণ নীতির তিনটি লক্ষণ আছে: প্রথমত, যে শিল্পকে সংরক্ষিত করা হবে তার ভবিষ্যৎ (অর্থাৎ আপেক্ষিক লাভের সম্ভাবনা) থাকা চাই; দ্বিতীয়ত, সংরক্ষণ পাবার পর শিল্পটির আশানুরূপ ভাবে বেড়ে ওঠা চাই। তৃতীয়ত, সেই বেড়ে ওঠা এমন হওয়া চাই যে এককালে তার আর সংরক্ষণের দরকার হবে না এবং সংরক্ষণশুল্ক সেসময় রহিত করা যেতে পারবে। কাজের বেলায় দেখা যায় প্রথম দুটি

লক্ষণ প্রায় সর্বত্রই ফোটে, কিন্তু শেষটি প্রায় কোথাও ঘটে না। একবার সংরক্ষণ দিলে তা রহিত করা কঠিন হয়।

এই হতে কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে সংরক্ষণ-শুল্ক জনসাধারণের স্বার্থ হানি ক'রে শিল্পের স্বার্থ সাধন করে। জার্মান পণ্ডিত শ্যুহ্‌লারও খানিকটা এই ধরনের মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এ অভিযোগ বড় জোর আংশিক সত্য। সংরক্ষণের সাহায্যে মোট জাতীয় আয় বাড়ান গেল, তারপর সংরক্ষিত শিল্পগুলির যেমন যেমন আয় হতে লাগল তেমনি তেমনি সম্ভবমত সে আয় ট্যাক্স করে আদায় করে জনসাধারণের মধ্যে আবার ছড়িয়ে দেওয়া হল—তাহলে আর শ্যুহ্‌লারের ও অভিযোগ খাটবে না। শুল্কও জনসাধারণের স্বার্থরক্ষাই করে, আর জাতীয় আয় বাড়াবার উৎসাহে সেই আয়ের সুষ্ঠু বণ্টন-ব্যবস্থা যদি কখনও অবহেলিত হয় তা বন্ধ করবার কলাকৌশলের অভাব অন্তত একালে আর নেই।

শুল্কনীতির কলাকৌশল

এই রকম কয়েকটি কলাকৌশলের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যাতে অপর দেশের কাছ থেকে শুল্কের সুবিধা আদায় করা যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক শুল্ক বসান হয়। একে বলা হয়ে থাকে সুবিধা-আদায়ের জন্য শুল্ক (Bargaining Tariff)। এর সাধারণত দুইটি রূপ। প্রথম রূপটি হচ্ছে এই: প্রথমে একটা সাধারণ হারে শুল্ক বসান হল, তার নাম সাধারণ শুল্ক (General Tariff)। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি করে সুবিধা করে দেওয়া হল এবং সুবিধা পাওয়া গেল ; তখন সাধারণ শুল্ক আর সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রইল না, বহুক্ষেত্রে এই রকম চুক্তিমূলক (conventional) শুল্কই বলবৎ

হল। এর নাম সেইজন্য সাধারণ ও চুক্তি-মূলক শুল্ক। সুবিধা-আদায়ের জন্য শুল্কের আর একটি বিশেষ প্রচলিত রূপ আছে, সেটি হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শুল্ক (Maximum and Minimum Tariff)। এতে একই সঙ্গে দুটি শুল্ক-হার প্রণয়ন করা হয়, একটি চড়া অপরটি নিচু। প্রয়োজনমত যে দেশের বিরুদ্ধে বা যে জিনিসের বিরুদ্ধে যেটি দরকার সেইটির প্রয়োগ করে সুবিধা আদায় করা হয়।

সুবিধা-আদায়ের শুল্কের উল্‌টো-দিক্‌টা হচ্ছে শাস্তিমূলক শুল্ক (Retaliatory Tariff)। শুল্কযুদ্ধে এ ধরনের শুল্ক প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া আজকাল এক ধরনের শুল্কের অনেক সময় দরকার হয়ে পড়ছে, যাকে বলা হয় Anti-Dumping Duty। অনেক সময় একটা জিনিসই বিদেশে বিক্রি করা হয় স্বদেশের চেয়ে কম দামে। এই রকম সস্তা দামে মাল ছাড়া হয় অনেক সময় লোকসান দিয়েও। এ রকম ঘটে অনেক কারণে। হয়তো কিছু বাড়তি মাল পড়ে আছে, নতুন মাল আসবার আগে সেগুলিকে সব বেচে দেওয়া হল সস্তা দামে। হয়তো বা বিদেশী শিল্পকে নষ্ট করে সেই বাজার দখল করবার চেষ্টায় এ রকম করা হল। হয়তো স্বদেশে উৎপন্ন জিনিসের রপ্তানির উপর রপ্তানি-সাহায্য আছে। সেইজন্য একই জিনিসের বিদেশের দাম স্বদেশের দামের চেয়ে সস্তা হল। যে দেশের ঘাড়ে এ রকম করে জিনিস চাপান হয় সেই দেশ শুল্কের সাহায্যে ওরকম জিনিস চাপান বন্ধ করতে পারে। অবশ্য এরকম প্রতিকার স্থায়ী না হতে পারে, শুল্ক বসাবার পর যদি বিদেশী উৎপাদক আরও কম দামে জিনিস ছাড়তে পারে তাহলে শুল্ক নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু শুল্ক বসিয়ে এ রকম জিনিস চাপান বন্ধ করব চেষ্টা প্রায়ই হয়ে থাকে।

কিন্তু শুল্কহারই সংরক্ষণনীতি বা বাণিজ্যনীতির একমাত্র অস্ত্র নয়।

আজকাল শুল্ক চুক্তির প্রাধান্য বেশি হয়ে উঠছে। এ রকম চুক্তির দুটি বড় ভাগ আছে। চুক্তি বহু তরফা হতে পারে, বা দুতরফা হতে পারে। যখন বহুদেশ একসঙ্গে পরস্পরের মধ্যে একটা নিয়ম বেঁধে নেয় তখন চুক্তিটা বহুতরফা, কিন্তু অনেক সময় দুটি দেশে বিশেষ বিশেষ সুবিধা আদান-প্রদানের চুক্তি হয়ে থাকে। এ রকম চুক্তিকে দুতরফা (Bilateral) বলা হয়ে থাকে। আজকাল বহুতরফা চুক্তির চেয়ে দুতরফা চুক্তির চলন বেশি।

এই ধরনের বহুতরফা বা দুতরফা চুক্তি শুধু শুল্ক-হারেই সীমাবদ্ধ নয়। আজকাল জিনিস আমদানি-রপ্তানির পরিমাণও সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। এর নাম পরিমাণ-নির্দেশ (Quota)। জার্মানি আমেরিকায় দশ লক্ষ টন লোহা পাঠাবে, তার বেশি পাঠাতে পারবে না, তার বদলে তাকে আমেরিকা হতে দশ লক্ষ টন গম নিতে হবে, এই ধরনের যে চুক্তি তাকে পরিমাণ-নির্দেশ বলা চলে। এককালে ফ্রান্সে এর খুব প্রচলন ছিল। জিনিসের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করবার আরও একটি কৌশল হয়েছে; সেটি হচ্ছে 'লাইসেন্স' ব্যবস্থা। কোনও দেশ থেকে রপ্তানি করতে হলে বা কোনও দেশে আমদানি করতে হলে সরকারি 'লাইসেন্স' চাই। এইভাবে সরকার তাঁদের খুশিমত পরিমাণ-নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

দুটি দেশের মধ্যে এই ধরনের চুক্তির বহু বিভিন্ন রূপ হতে পারে, তার মধ্যে Most-Favoured-Nation Treatment বা সর্বাপেক্ষা সুবিধা দেওয়ার নীতি অন্যতম। ধরা যাক্, আমেরিকা ও জার্মানির মধ্যে এই চুক্তি হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, আমেরিকা যখনই অন্য কোনও দেশকে যে সুবিধা দেবে জার্মানিকেও সঙ্গে সঙ্গে সেই সুবিধা দেবে। এটা হচ্ছে বিনাশর্তে সর্বাধিক সুবিধা দেবার উদাহরণ। আবার শর্তাধীনে সুবিধা দেবার উদাহরণও পাওয়া যায়। ধরা যাক্,

ইংলণ্ডের কাছ থেকে খুব বেশি একটা সুবিধা পেয়ে আমেরিকা ইংলণ্ডকেও একটা সুবিধা দিয়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে চুক্তি করতে চাইছে। এক্ষেত্রে ইংলণ্ডকে প্রদত্ত সুবিধা জার্মানির সঙ্গে উক্ত চুক্তি অনুসারে জার্মানিকেও দিতে হবে। যদি শর্ত থাকে যে এসব ক্ষেত্রে জার্মানি সে সুবিধা পাবে সত্য, কিন্তু তার জন্য তাকেও ইংলণ্ডের সমান সুবিধা আমেরিকাকে দিতে হবে তাহলে এটা শর্তাধীন সর্বাধিক সুবিধা দেওয়ার উদাহরণ হল। এ রকম সুবিধা দেওয়া অবশ্য একতরফাও হতে পারে, দুতরফাও হতে পারে। এমন হতে পারে যে জার্মানি সুবিধা না দিলেও আমেরিকা তাকে সুবিধা দিয়ে যাবে। এটা একতরফা ব্যবস্থা। সুবিধা দেওয়াটা উভয়ত হলে সেটা দুতরফা।

এই মহাযুদ্ধে চুক্তির কতরকম হেরফের হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। দরকারমত সব বিষয়েই চুক্তি হয়েছে, ঋণ ও ইজারাদান ব্যবস্থা যার একটা চরম উদাহরণ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বহুবিধ চুক্তি হতে পারে একথা আর নতুন নেই।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য কলাকৌশল

কিন্তু শুল্কনিয়ন্ত্রণই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় নয়। বিশেষত, আজকাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যত গোলমাল দেখা দিচ্ছে নিয়ন্ত্রণ-কৌশলও তেমনই প্রচুর উদ্ভাবিত হচ্ছে। তার মধ্যে কতকগুলি প্রধান প্রধান বিভাগের কথা উল্লেখ করব।

(ক) জিনিস লেনদেন নিয়ন্ত্রণ। শুল্কের সাহায্যে জিনিস লেনদেন নিয়ন্ত্রণ হতে পারে একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু তা ছাড়া আরও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের কৌশলও আছে। যেমন, ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে চুক্তি হল যে ফ্রান্স প্রতি বছর জার্মানি হতে এক লক্ষ চশমার কাঁচ আমদানি

করবে কিন্তু তার বদলে জার্মানি ফ্রান্স থেকে এক লক্ষ গজ রেশম নিতে বাধ্য থাকবে। এ ক্ষেত্রে জিনিসের পরিমাণ (Quota) বেঁধে দেওয়া হল, সেইজন্য এর নাম পরিমাণ-নির্দেশ বা Quota-system। এ ছাড়া লাইসেন্স প্রবর্তন জিনিস-চলাচল নিয়ন্ত্রণের বড় উপায়। সরকারি লাইসেন্স না পেলে কেউ কোনও একটা জিনিস আমদানি করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে লাইসেন্সের সাহায্যে জিনিস-চলাচলের গতি ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

(খ) শুল্ক-নিয়ন্ত্রণ। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হল। শুল্ক-চুক্তি, পক্ষপাতমূলক শুল্কব্যবস্থা, সব-চেয়ে সুবিধাদানের নীতি, সংরক্ষণ-শুল্ক—এসমস্তই এর অন্তর্ভুক্ত।

(গ) মুদ্রা ও মুদ্রাবিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ। এ সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা পূর্বে হয়েছে এবং সমীকরণ ভাণ্ডারের উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়াও নানারকম নিয়ন্ত্রণ হতে পারে। (১) Clearing Agreement তার মধ্যে অন্যতম। এই চুক্তির মোট কথাটা হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির মধ্যে টাকার লেনদেন যথাসম্ভব কাগজে কলমেই হবে, পাওনা কাটাকাটি হয়ে যাবে। এরকম কাটাকাটির পরও যদি কোনও পক্ষের কিছু দেয় হয় কেবল তখনই টাকা চলাচল হবে। এর ফলে কথায় কথায় টাকা চলাচলের দরকার হয় না, বিনিময়-হারের উপর চাপ পড়ে কম।

(২) তা ছাড়া মুদ্রা-বিনিময় হার পারস্পরিক চুক্তি করে বেঁধে ফেলা যেতে পারে। দুটি দেশ চুক্তি করে স্থির করতে পারে যে তারা পরস্পরের সম্মতি ভিন্ন একটা নির্দিষ্ট হারের উপরে বা নিচে মুদ্রা-বিনিময় হতে দেবে না।

(৩) মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য আজকাল বিভিন্ন দেশের পক্ষে তফাত করে দেওয়া হচ্ছে। একই দেশের মুদ্রার মূল্য সকল দেশের পক্ষে বা

সব ব্যবসার পক্ষে নয়। জার্মানিতে এই কৌশলটির উদ্ভব হয়, সেখানে সাত আট রকমের বিভিন্ন মূল্যের মার্ক চলত। নিচের হিসাব হতে তা বোঝা যাবে :—

		১৯২৯ সালের স্বর্ণমূল্যের শতকরা কত ভাগ মূল্য ১৯৩৭ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে হয়েছে
১।	সরকারি মার্ক (Official Mark) ...	৯৯'৯%
২।	রেজিষ্টার মার্ক (Register Mark) ...	৫৩'০%
৩।	রেইজ্ মার্ক (Reise Mark) ...	৬৩'১%
৪।	ক্রেডিটস্পার মার্ক (Kreditspaar Mark)...	১৮'১%
৫।	এফেক্‌টেন স্পার মার্ক (Effektanspaar Mark)	১৮'০%

(Docker : *Foreign Exchange* হতে গৃহীত)

এর মধ্যে Blocked Mark বা আটকান-মার্কের উল্লেখ নেই, কিন্তু তা-ও জার্মানিতে প্রচলিত ছিল। আটকান-মার্কের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সে মার্ক জার্মানির বাইরে যাবে না, জার্মানির মধ্যে জিনিস কেনাতেই খরচ করতে হবে। জার্মানি জিনিস আমদানি করল, তার বদলে পাওনাদারকে দিল আটকান-মার্ক। তখন পাওনাদার সেই মার্ক ভাঙিয়ে নগদ টাকা তার দেশে নিয়ে যেতে পারবে না—তাকে সেই মার্ক দিয়ে জার্মান জিনিস কিনে নিয়ে যেতে হবে। এই উপায়ে জার্মানি তার রপ্তানি বাড়াতে চেয়েছিল। অবশ্য এই ব্যবস্থায় পাওনাদারদেরও প্রায় অসুবিধা হত না, কেননা, দেখা গেছে অনেক সময় নিষেধ না থাকলেও তারা এমনিতেই হয়তো জার্মানি থেকে জিনিস কিনত।

আজকাল এই সব কৌশল জার্মানির একচেটিয়া নেই। বিনিময়-হার যখন সরকারি হুকুমে স্থির হয় তখন বিভিন্ন দেশের জন্য বিভিন্ন

বিনিময়-হার স্থির করা মোটেই কঠিন নয়, তা বাস্তবক্ষেত্রে বহুস্থানেই ঘটছে। আর সম্প্রতি ইংরেজ গবর্মেণ্ট যে ভারতের পাওনা স্টার্লিং ভারতকে খুশিমত ব্যবহার না করতে দিয়ে আটকে রেখে দিয়েছেন সেটি তো আটকান-মার্কের মত আটকান-স্টার্লিঙের নিদর্শন।

(৪) বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের অধিকার নিয়ন্ত্রণ মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণের আর একটা রূপ। এই মহাযুদ্ধে এরকম কড়াকড়ি সর্বত্র হয়েছে। যেমন, সরকারী অনুমতি ছাড়া ভারতীয় আমদানিকারকদের স্টার্লিং বিল বা ডলার বিল কেনবার উপায় নেই। সুতরাং তারা সরকারি অনুমতি ছাড়া বিলিতি বা আমেরিকান পাওনাদারদের পাওনা মেটাতে পারে না। এইভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ হতে পারে। তার উপর জিনিস ও মূলধন চলাচলের উপর এইরকম সরকারি নিষেধাজ্ঞাও এই যুদ্ধের সময় বসেছে।

এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, বেশির ভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয় সরকারের হাত দিয়ে। সাধারণ বণিকদের বদলে সরকারই বেশির ভাগ বাণিজ্য চালান, যেখানে বণিকরা ব্যবসা চালায় সেখানেও তারা সরকারের প্রতিনিধি বা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন যন্ত্রমাত্র। নিয়ন্ত্রণের একটা কুফলই হচ্ছে যে অনেক সময় একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে ওঠে। অনেকক্ষেত্রে সরকারই ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করেন, আর যেখানে সরকার অমন শনির দৃষ্টি দেন না সেখানেও সরকারি আওতায় দুচারজন বড় ব্যবসাদার একচেটিয়া অধিকার পায়। হাজার জন হাজার দিকে টানলে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা কঠিন হয়, সেইজন্য নিয়ন্ত্রণের আবহাওয়া একচেটে ব্যবসা গড়ে ওঠার বিশেষ অনুকূল।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্পূর্ণ তত্ত্ব

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্পূর্ণ তত্ত্বের মধ্যে এ সমস্তই অন্তর্ভুক্ত, কারণ প্রত্যেকটিরই প্রভাব আপেক্ষিক লাভের উপর পড়ছে। শুধু কতটা আপেক্ষিক লাভ আছে তা জানলেই বাস্তব অবস্থা বোঝা যায় না, তার সঙ্গে মূলধন চলাচল, মুদ্রাহার ও মুদ্রাব্যবস্থা, শুল্কহার ও শুল্কব্যবস্থা—এসব কথাই জানা দরকার।

কিন্তু এখানেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানা হল না। সম্প্রতি বাণিজ্যের সম্বন্ধে খুব দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে এবং মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে। সুতরাং এ পর্যন্ত যে তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ছোট ডাইনামিক্‌স্, এখন বড় ডাইনামিক্‌সের চক্রের মধ্যে এই ছোট ডাইনামিক্‌সের আলোচনা করা দরকার।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক সমস্যা

আজকাল এই যে এতরকম সংকট ও এতরকম নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে, দিন দিন নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে তার আসল কারণটা কি? তার আসল কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিন্যাসে একেবারে মৌলিক পরিবর্তন হচ্ছে, এটা সেই নবজন্মের বেদনা। এই কথাটা বুঝতে হলে একটু ইতিহাস জানা দরকার।

গত শতকে আন্তর্জাতিক কারবার খুব নির্বাধে চলত, স্বর্ণমানও বেশ স্বয়ংক্রিয় ভাবে চলতে থাকত—কোথাও বড় একটা গোলমাল হত না। তার কারণ তখন একটা ভারসাম্য ছিল। এই ভারসাম্যের মূল ছিল সেকালের অর্থনৈতিক বিন্যাসে।

সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের লেনদেন অনেকটা সমানে

সমানে হত। প্রতীচ্যের শিল্পপদ্ধতি প্রাচ্যের শিল্পপদ্ধতির চেয়ে বেশি কিছু উন্নত ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে অবস্থা বদলে গেল। প্রতীচ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটল শিল্পবিপ্লব, আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। প্রতীচ্যের অনেক দেশেই এই দুইটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটেছিল, কিন্তু তার মধ্যে ইংলণ্ড সর্বপ্রধান। তার সাম্রাজ্য জগতজোড়া হয়ে পড়ল। সাম্রাজ্য বাড়ার সঙ্গে ইংলণ্ড তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার যুগপৎ প্রয়োগ করে অধীন দেশগুলিতে যে সব শিল্প ছিল বা শিল্প-সম্ভাবনা ছিল সেগুলিকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে তারপর অবাধ বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করল এবং অধীন দেশগুলিকেও সেই নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করল।[৪] যে সব দেশ ইংলণ্ডের অধীন ছিল না তারা সেই সেই যুগেই সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করেছিল, ইংলণ্ডের এই ফাঁদে পা দেয়নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি সাম্রাজ্যবান্ দেশ সমগ্র জগতে প্রধান হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে

৪। ভারতবর্ষে এই প্রক্রিয়া কি ভাবে চলেছিল তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় রমেশচন্দ্র দত্তের *Economic History of India* নামক বইটিতে। একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করছি: While British Political Economists professed the principles of free trade from the latter end of the eighteenth century, the British nation declined to adopt them till they had crushed the Manufacturing Power of India and reared their own Manufacturing Power. Then the British Nation turned free traders and invited other nations to accept free trade principles. The other nations, including British colonies, knew better; and are now rearing their Manufacturing Power by protection. But in India the Manufacturing Power of the people was stamped out by protection against her industries and then free trade was forced on her to prevent a revival. —(*Economic History of India*, Vol. I, p. 302.)

অবস্থা দাঁড়াল এই যে, দুই একটি দেশের শিল্পপদ্ধতি খুব উন্নত হয়ে উঠল, তারা অনেক মূলধন জমিয়ে ফেলল এবং জগতময় কারবার বাড়াতে লাগল। জগতের বাকি সব দেশ তাদের কাঁচামাল জোগান দিতে লাগল এবং তাদের প্রেরিত পণ্যদ্রব্য কিনতে লাগল। এ ভাবে ভারসাম্য বজায় থাকা মোটেই কঠিন নয়। তা ছাড়া তখন আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্র ছিল লণ্ডন। কাজেই দেশে দেশে যে সোনা চলাচল বা মূলধন চলাচলের দরকার হত তা অনেক সময়েই লণ্ডনের মারফত হত। ফলে অনেকক্ষেত্রেই দেনাপাওনা কাটাকাটি হয়ে যেত, সত্যিকারের সোনা চলাচলের দরকার খুব বেশি হত না, বা হলেও তা খুব বৃহৎ পরিমাণে হত না।

গত মহাযুদ্ধের সময় এ সমস্তই বদলে গেল। কিছুদিন পূর্বে হতেই জগতময় একটা মৌলিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল, যে সব দেশ এ পর্যন্ত কৃষিপ্রধান ছিল এবং কাঁচামালই সরবরাহ করেছে তারাও ক্রমে ক্রমে শিল্প ও ব্যবসা গড়ে তুলতে আরম্ভ করেছিল। অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধারাই হচ্ছে কৃষি হতে শিল্প, শিল্প হতে ব্যবসা। ভারতবর্ষেও তো শিল্প গড়বার আকাঙ্ক্ষা স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই জোর হয়ে উঠেছিল বলতে হবে। যুদ্ধের সময় বহুদেশের শিল্পসম্ভার খুব বেড়ে গেল, ফলে ইংলণ্ড এবং আর দুএকটি দেশ শিল্প এবং ব্যবসার জগতে যে অপ্রতিহত ভাবে প্রভুত্ব করে আসছিল তা আর রইল না। উপরন্তু যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি বনেদি দেশগুলিকে বহু মূলধন ভাঙতে হল, বহু দেনা করতে হল। আমেরিকা এ পর্যন্ত প্রবীণ অধমর্ণ দেশ ছিল, এখন সে হয়ে দাঁড়াল নবীন উত্তমর্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনে নিউইয়র্কের গুরুত্ব লণ্ডনের চেয়ে আর কম রইল না।

এর ফলে সমস্তই গোলমাল হয়ে গেল। যে সব দেশ নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলছিল তারা সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করায় আগের মত অবাধ বাণিজ্য আর চলল না। উপরন্তু ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি যে সব দেশ তখনও পশ্চাৎপদ ছিল সে সব দেশেও ইংলণ্ডের একচেটে ব্যবসাতে আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি নতুন উঠতি দেশগুলি ভাগ বসাতে আরম্ভ করল। এই মৌলিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আগে যেমন স্বয়ংক্রিয় স্বর্ণমান বেশ নির্বিবাদে চলত তা আর সম্ভব রইল না। এই মৌলিক পরিবর্তনের সঙ্গে যোগ দিল যুদ্ধোত্তর কতকগুলি সমস্যা। রাজনৈতিক কারণে মূলধন দমকা হাওয়ার মত এদেশ হতে ওদেশে উড়ে বেড়াতে লাগল, তার ফলে মুদ্রা, বিনিময় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ল।

সবচেয়ে গোল বেধেছিল জার্মানির কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ নিয়ে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ আমেরিকার কাছে যে টাকা ধার করেছিল সেই টাকা তারা শোধ দেবে মনে করেছিল জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে। কিন্তু এইখানেই বাধল গোল। জার্মানি থেকে ওভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় প্রকৃতপক্ষে সম্ভব ছিল না। যুদ্ধের পর ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের দরকার ছিল রপ্তানি বাড়াবার, তা না হলে তাদের আয়ও বাড়া সম্ভব ছিল না আর যুদ্ধের সময় যে প্রচুর লোক নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের কাজ দেওয়াও সম্ভব ছিল না। অথচ জার্মানি থেকে নানা পণ্যসম্ভারে যে ক্ষতিপূরণ ইংলণ্ড, ফ্রান্সকে নিতে হচ্ছিল সে পণ্যসম্ভার নিলে তাদের নিজেদের শিল্প আঘাত পায়। এরই নাম মান রাখতে প্রাণান্ত। ক্ষতিপূরণ না নিলে মান যাবে কিন্তু ক্ষতিপূরণ নিতে হলে দেশের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও বেকার-সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং শুরু হল জার্মানিকে নতুন করে

টাকা ধার দেবার পালা, যাতে সে ক্ষতিপূরণ দিতে পারে। এও বাঁ হাত দিয়ে টাকা দিয়ে ডান হাত দিয়ে টাকা নেওয়া। কিন্তু এ ব্যাপারও চলছিল ভালই, যতদিন জার্মানি আমেরিকার কাছে নতুন নতুন ধার পাচ্ছিল। কিন্তু ক্রমশ এই সব ব্যাপারে লোকসান হওয়ায় আমেরিকার সুর ফিরল, তারা একদিকে জার্মানিকে নতুন নতুন ধার দিতে আর উৎসাহিত হল না এবং অন্য দিকে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের কাছে পাওনা দাবি করে বসল। আর যাতে আমেরিকায় কোনও পণ্য সহজে না ঢুকতে পারে তার জন্য অসম্ভব চড়া হারে সংরক্ষণ-শুল্কও সঙ্গে সঙ্গে বসল। এর উপর আবার বিপদ জুটল সে সময়ের মুদ্রা-মূল্যের বিভ্রাট। সে সময় প্রত্যেক দেশেই বিনিময়-হার নতুন করে স্থিরীকৃত হচ্ছিল, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই উচিত মুদ্রামূল্য নির্ধারিত হয়নি। তার ফলে বহু দেশেই গোলমাল দেখা দিচ্ছিল। কাজেই একটি সংকটের আভাস দেখা দিতেই আমেরিকার মধ্যস্থতায় জার্মানি যাতে ক্ষতিপূরণ সত্যি সত্যি দিতে পারে তার এক পরিকল্পনা তৈরি হল। এরই নাম ড্যস পরিকল্পনা। কিন্তু ভেতরে গোলমাল থাকলে এ সব বাহ্য প্রলেপে কোনও ফল হয় না। ড্যস পরিকল্পনা বিফল হতে ইয়ং পরিকল্পনা বলে আর একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হল বটে, কিন্তু তা কাজে পরিণত হবার আগেই বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দিল। ১৯৩১ সালে ইংলণ্ডে গোলমাল খুব বেশি হয়ে উঠল। সংকটতরণের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হুভার প্রস্তাব করলেন যে কিছুদিনের জন্য প্রত্যেক দেশেরই যুদ্ধঋণের দেনাপাওনা বন্ধ থাক। এর নাম হুভার মোরেটরিয়াম। কিন্তু তাতেও ফলোদয় হল না, ১৯৩১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে স্বর্ণমান রহিত করা হল।

একটা জিনিস এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার। যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক গোলমাল যত বাড়ছিল সে সময় যে সব দেশের বড় সাম্রাজ্য

ছিল তারা সেই সব সাম্রাজ্যের উপরই বেশি নির্ভর করতে আরম্ভ করেছিল। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি হিসাব হতে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়:

যুক্তরাজ্যের ব্যবসা (মোট ব্যবসার শতকরা কত অংশ কোন্ দেশের সঙ্গে হয়)

আমদানি	১৯২৮ সাল	১৯৩৫ সাল	১৯৩৮ সাল
১। ভারতবর্ষ ও অন্য ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন হতে যুক্তরাজ্যে আমদানি	৪৮%	৬৮%	৬৯%
২। ইউরোপের সাগরপারের অধিকৃত দেশগুলি হতে যুক্তরাজ্যে আমদানি	২৮%	৩০%	৩৩%
রপ্তানি			
১। যুক্তরাজ্য হতে ভারতবর্ষ ও অন্য ব্রিটিশ ডোমিনিয়নে রপ্তানি	৭৫%	৭৬%	৭৩%
২। যুক্তরাজ্য হতে ইউরোপের সাগরপারে অধিকৃত দেশগুলিতে রপ্তানি	৩৭%	২৯%	৩২%

ফ্রান্সের ব্যবসা (মোট ব্যবসার শতকরা কত অংশ কোন্ দেশের সঙ্গে হয়)

	মোট আমদানির কত অংশ কোন্ দেশ হতে আসে	মোট রপ্তানির কত অংশ কোন্ দেশে যায়

	১৯২৮ সাল	১৯৩৮ সাল	১৯২৮ সাল	১৯৩৮ সাল
১। ইংলণ্ড, জার্মানি, বেলজিয়ম, সুইজারল্যাণ্ড	২৮	২৩	৪৭	৩৯
২। ইউরোপের অন্য শিল্পপ্রধান দেশগুলি	৮	৬	৯	৮
৩। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি (রুশিয়া ছাড়া)	৭	৫	৮	৮
৪। ফ্রান্সের অধীন সাগরপারের দেশগুলি	১৩	২৭	১৮	২৭
৫। ইংলণ্ডের অধীন দেশসমূহ, ভারতবর্ষ ও ডোমিনিয়নগুলি	১২	১০	৩	৩
৬। অন্যান্য দেশ	৩২	২৯	১৫	১৫
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০

মূলধন চলাচলেও অনুরূপ প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছিল। যে সব দেশের সাম্রাজ্য ছিল না তাদের মধ্যে কোনও কোনও দেশ (যেমন আমেরিকা) শুল্কপ্রাচীর তুলে দিয়ে নিজেদের মধ্যেই ডুবে রইল, কোনও কোনও দেশ দুটি চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট দেশের সঙ্গে একজোট বাঁধল (যেমন জার্মানি মধ্য-ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে একটা কারবার গড়ে তুলেছিল)।

মন্দা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই রকম দল বাঁধার প্রবৃত্তি বেড়ে গেল। সবাই ভাবল আমরা দল বেঁধে আত্মরক্ষা করি, মন্দার ঝড় অপরের উপর দিয়ে যায় তো মন্দ কি। অবশ্য কতকগুলি দেশের মুদ্রামূল্য ও দামের স্তর খানিকটা একরকম থাকায় ঐ ধরনের দল বাঁধার সুবিধাও হয়েছিল। ইংলণ্ডে স্বর্ণমান রহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড, তার

ডোমিনিয়নগুলি, ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী আরও কতকগুলি দেশ নিয়ে একটা দল গড়ে উঠল। এই দলের প্রধান খুঁটি ছিল স্টার্লিং, সেইজন্য এ দলের নাম হল স্টার্লিং দল। তেমনি সে সময় ফ্রান্স, হলাণ্ড, সুইজারলাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি দেশ স্বর্ণমান আঁকড়ে রইল, তাদের নাম হল স্বর্ণদল। ওধারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সোনা আঁকড়ে থাকলেও এ দলের সঙ্গে স্বভাবতই মিশে যেতে পারে নি—তার অনুরূপ দামপর্যায় ও মুদ্রামূল্যের কতকগুলি দেশ নিয়ে (এদের মধ্যে দক্ষিণ-আমেরিকার অনেক দেশ ছিল) একটা ডলারদল গড়ে উঠেছিল। এসিয়াতে জাপান মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, চীনের অধিকৃত অংশ এবং তার সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশগুলি নিয়ে একটা দলের মত গড়ে তুলেছিল, তাকে কেউ কেউ বলেন ইয়েন দল। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের পালাও আরম্ভ হয়ে গেল, তা না হলে বাইরের আঘাত এ সমস্ত ব্যবস্থা উলটপালট করে দেয়। ইংলণ্ড অটোয়াচুক্তি করে তার সাম্রাজ্যের মধ্যে পরস্পরকে সুবিধাদানের নীতিতে পরস্পরের ব্যবসার প্রসারের চেষ্টা করেছিল।[৫] জার্মানি আটকান-মার্ক প্রভৃতি নানা কৌশল করে, বিশেষ করে তার কাছাকাছি কয়েকটি দেশে, বাণিজ্য বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল, ফ্রান্স পরিমাণ-নির্দেশ এবং অন্যান্য কৌশলের সাহায্য নিল, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও (তখন যুক্তরাষ্ট্রেও

৫। ইংলণ্ডের তরফ থেকে বলড্‌ইন বলেছিলেন—What then should be the first aim of the Conference? It should be to clear out channels of trade among ourselves.। তাছাড়া চুক্তিতে যে নীতি লিপিবদ্ধ হয়েছিল সেটি এই :—"That by the lowering or removal of barriers among themselves provided for in [the] agreements the flow of trade between the various countries of the Empire will be facilitated, and that by the consequent increase of the purchasing power of their peoples the trade of the world will also be stimulated and increased." (H. V. Hodson : *Recovery and Slump*, p. 115).

স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হয়েছে এবং গোলমাল দেখা দিয়েছে) চুক্তি করে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ও প্রসারের চেষ্টা করছিল :—

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ
(১৯৩৪ সাল ও ১৯৩৫ সালের তুলনায় ১৯৩৬ সালে শতকরা কত বেড়েছে)

	রপ্তানি		আমদানি	
	১৯৩৪ সাল	১৯৩৫ সাল	১৯৩৪ সাল	১৯৩৫ সাল
১। যে সব দেশের সঙ্গে চুক্তি আছে তাদের সঙ্গে, মোট	২২.২	১৪.১	৪৬.৮	২১.৯
২। যে সব দেশের সঙ্গে চুক্তি নেই তাদের সঙ্গে, মোট	১১.৩	৪.০	৪৫.৭	১৫.৬

এইভাবে নিজেদের মধ্যে এক একটা দল গড়ে তুলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু এ চেষ্টা খানিকটা এগোলেও শেষ পর্যন্ত টেকে নি। ১৯৩৩ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক সংকট দেখা দিল, ক্রমে সেখানেও স্বর্ণমান রহিত হল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কদের নানারকম গোলমাল, অধিক উৎপাদন ও দাম কমা, বেকার-সমস্যা প্রভৃতি প্রবল হয়ে উঠল। আমেরিকায় গোলমাল আরম্ভ হবার কিছুকাল পরেই ফ্রান্স এবং স্বর্ণদলীয় অন্যান্য দেশেও গোলমাল শুরু হয়। আমেরিকা কর্তৃক অনুসৃত মুদ্রানীতির ফলে সোনা ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে আমেরিকায় হাজির হতে লাগল। সে ধাক্কাও হয়তো কোনও রকমে সামলান যেত, কিন্তু রাজনৈতিক গোলমাল ক্রমশ বাড়তে থাকায় ধাক্কা শেষ পর্যন্ত সামলান গেল না। ইটালির আবিসিনিয়া আক্রমণ এবং ইটালির উপর স্যাঙ্কসন্ প্রয়োগ, পোলাণ্ডের স্বর্ণদল ত্যাগ, স্পেনের গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি কারণে স্বর্ণদল ক্রমশ ভাঙতে লাগল। অবশেষে তিনটি বড় দেশ একত্রিত হয়ে তাদের মুদ্রামূল্য স্থির রাখার চেষ্টা করে। ১৯৩৬ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর

তারিখে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকা একযোগে পারস্পরিক সহযোগিতায় ফ্রাঁর মূল্য কমাবার ব্যবস্থা করে। এরকম চুক্তি মুদ্রার ইতিহাসে নতুন। অন্যান্য দেশও এই ত্রিশক্তির চুক্তিতে যোগ দেয়। এইভাবে স্টার্লিংদল, স্বর্ণদল এবং ডলারদলের মধ্যে একটা ভারসাম্য আনবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এতে সাময়িক একটু উপকার হলেও স্থায়ী উপকার হল না। বিশেষত ঐ চুক্তির একটা যে বিঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল চড়া শুল্কহার বা পরিমাণ-নির্দেশ প্রভৃতি বাধানিষেধ কমান, সেদিকে কিছু করা সম্ভব হয় নি। তারপর ১৯৩৭ সাল থেকেই আবার দাম চড়তে আরম্ভ হল, মহাযুদ্ধের আভাস তখনই দেখা দিতে শুরু করেছে।

বর্তমান মহাযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

মহাযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমস্ত স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায়, আপেক্ষিক লাভের চেয়ে বর্তমান দরকারটাই বড় হয়ে ওঠে। তবু মহাযুদ্ধের সময়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি ও গতি আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, এরকম মহাযুদ্ধের সময় নিয়ন্ত্রণের নানারকম কৌশল আবিষ্কৃত হয়, যা অনেক সময় যুদ্ধ মিটে গেলেও কাজে লাগে, অর্থনৈতিক জগতে সেগুলির একটা স্থায়ী আসন হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, এইরকম মহাযুদ্ধের ফলে অনেক বড় বড় দেশ চিরকালের মত অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ে, আবার অনেক নতুন নতুন দেশের শক্তি সঞ্চয় হয়। তার ফলে বাণিজ্যের গতি চিরকালের মত বদলে যায়।

এই মহাযুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি ও গতি দুই-ই বদলাবে। প্রথমেই, নিয়ন্ত্রণের যেসব কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি। এ সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, এবার প্রত্যেক যুদ্ধরত দেশই তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে

নিয়ন্ত্রণ করে তাকে যুদ্ধের কাজে লাগিয়েছে—এরকম সার্বিক নিয়ন্ত্রণ আগে বড় হয় নি। জিনিস আমদানি বা রপ্তানি সরকারি অনুমতিসাপেক্ষ; অনেকক্ষেত্রে জিনিস আমদানি রপ্তানি সরকার নিজেই করে থাকেন, যেখানে তা হয় না সেখানে ব্যবসাদারেরা আছে বটে, কিন্তু তাদের সরকারের এজেন্ট হিসাবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারবার করতে হয়। বিদেশী মুদ্রা কিনবার অধিকারও সরকারের অনুমতিসাপেক্ষ। কোনও মূলধন স্বদেশে বা বিদেশে লগ্নি করতে হলে সরকারের অনুমতি চাই। এসব নিয়ন্ত্রণ ভারতবর্ষেও ঘটেছে, সুতরাং এবিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই যুদ্ধে আন্তর্জাতিক কারবারে কয়েকটা নতুন কৌশল দেখা দিয়েছে, ইজারা-ঋণ তার মধ্যে অন্যতম। যুদ্ধের প্রথম পর্বে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডের কাছ থেকে নগদ নগদ দাম নিয়ে তবে জিনিস দিচ্ছিল। সেইজন্য ডলার জোগাড় করতে ইংলণ্ডের প্রাণান্ত হচ্ছিল। ইংলণ্ডের হাতে পূর্ব হতে যে সব আমেরিকার ঋণপত্র ছিল তাকে সেগুলি আবার আমেরিকায় বেচে ডলার সংগ্রহ করতে তো হলই, তা ছাড়া আরও যেখানে যেখানে ডলার পাওয়া যাচ্ছিল সবই ইংলণ্ড যথাসাধ্য চেষ্টায় জোগাড় করছিল। যেমন, ভারতবর্ষের কাছ থেকে আমেরিকা কিছু কিছু জিনিস কেনায় ভারতবর্ষের হাতে কিছু ডলার জমেছিল। ভারতবর্ষে আইন করা হল এই ডলার ভারতবর্ষ স্বেচ্ছামত আমেরিকাকে বা অন্য দেশকে দিয়ে আমেরিকা বা অন্য দেশের সঙ্গে স্বাধীন বাণিজ্য করতে পারবে না, এই ডলার ইংলণ্ডকে দিতে হবে, তার বদলে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের নামে স্টার্লিং লিখে দেবে। কিন্তু এত চেষ্টাতেও ইংলণ্ড যথেষ্ট ডলার পাচ্ছিল না। তখন এই ইজারা ও ঋণ ব্যবস্থা শুরু হল। এর গোড়ার কথাটা হচ্ছে, আমেরিকা অন্য দেশকে প্রয়োজনমত জিনিস দিচ্ছে, পরে সে সেই জিনিসগুলি ফেরত নেবে। ক্রমে উলটো ইজারা-

ঋণও আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ, যে সব দেশকে আমেরিকা ইজারা-ঋণ দিচ্ছে সেই-সব দেশও আবার আমেরিকাকে যথাসাধ্য ইজারা-ঋণ দিচ্ছে। যেমন, আমেরিকা ইংলণ্ডকে উড়োজাহাজ ইজারা-ঋণে দিচ্ছে, আবার যখন আমেরিকার সৈন্য ইংলণ্ডে আসছে তখন তাদের থাকবার জায়গা, খাবার ব্যবস্থা ইংলণ্ড ইজারা-ঋণে করে দিচ্ছে, তার জন্য নগদ দাম নিচ্ছে না। এর গোড়ার কথাটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক দেনাপাওনার হিসাবটা আপাতত তুলে দিয়ে একটি সাধারণ ভাণ্ডারে যে যতটা পারে দিচ্ছে। তারপর এইরকম ভাণ্ডারের দরকার মিটে গেলে হিসাব কষাকষি হবে। এখন পর্যন্ত ব্যাপারটি দেখতে খুব ভাল, কিন্তু যখন হিসাব কষার সময় আসবে তখনও যে ব্যাপারটি এমন চমৎকার থাকবে তা বলা যায় না। এখন যে সব দেশ বিরাট পরিমাণে ইজারা-ঋণ পাচ্ছে পরে যদি তাদের সেইসব জিনিসই শোধ করতে হয় তাহলে তা যুদ্ধের সাধারণ ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থারও অধম হয়ে দাঁড়াবে। আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিও বিকৃত হবে। সব দেশই যুদ্ধের পর আমেরিকাকে (ধরা যাক্) বোমারু বিমান ফেরত দিতে আরম্ভ করল। যুদ্ধের পর আমেরিকা অত বোমারু বিমান নিয়ে করবে কি? আর যুদ্ধের পরও ইজারা-ঋণগ্রস্ত দেশগুলি যদি আমেরিকার জন্য বোমারু বিমানই তৈরি করতে থাকল তাহলে তারা অন্য দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ব্যবসা হয়তো করতেই পারবে না, তাদের স্বদেশের বাণিজ্যও তো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে না। ধরা যাক্, আমেরিকা তখন সামরিক বিমানের বদলে বে-সামরিক বিমানে ইজারা-ঋণের শোধ চাইল। তাতেও বিপদ কমবে না। প্রথমত, তাতে আমেরিকার বিমানশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তখন যদি আমেরিকা শুল্কপ্রাচীর তুলতে চায় তাহলে ইজারা-ঋণগ্রস্ত দেশগুলির শিল্পে গোলমাল শুরু হবে। অবশ্য আমেরিকা

যদি বে-সামরিক বিমান নিতে রাজিও থাকে এবং কোনও শুল্কপ্রাচীর না তোলে তাহলেও ইজারা-ঋণগ্রস্ত দেশগুলির বিপদ বড় কমবে না, কারণ তাদের সমস্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি এবং সমগ্র শিল্পের কাঠামো আমেরিকার ইজারা-ঋণের চাপে নিয়ন্ত্রিত হবে। যদি ইজারা-ঋণ সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হয় তা হলে ভবিষ্যতে বিশেষ গোলমালের সম্ভাবনা। অবশ্য আমেরিকা বলতে পারে যে ইজারা-ঋণের বদলে জিনিস না পাঠিয়ে ঋণগ্রস্ত দেশগুলিতে তাকে অর্থনৈতিক সুবিধা ও অধিকার দেওয়া হোক কিন্তু তার অর্থ হচ্ছে আমেরিকার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার।

এই মহাযুদ্ধের ফলে জগতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিও অনেক-ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে বদলে যাবে মনে হয়। ইংলণ্ড ক্রমশ পাওনাদার দেশ থেকে দেনদার হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এমন কি ভারতবর্ষের কাছেও তার দেনা হচ্ছে। গত মহাযুদ্ধে আমেরিকা বড় হয়ে উঠেছিল, এবার সে ভয়ানক বড় হয়ে গেল। কানাডা প্রভৃতি বহু কৃষি-প্রধান এবং অধমর্ণ দেশ এই যুদ্ধে শিল্পপ্রধান এবং উত্তমর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে হিসাবে শুধু যে ইংলণ্ডের পূর্বের লগ্নিকৃত মূলধন ভেঙে গেল এবং তাকে তার উপরও দেনা করতে হল তাই নয়, যে সব দেশ এতদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডের পণ্যের গ্রাহক ছিল তারা এখন নিজেরাই সে সব পণ্য উৎপাদন করতে পারবে। লীগ অফ নেশনসের একটি সাম্প্রতিক আলোচনা (*Network of World Trade*) হতে কয়েকটি কথা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়: (১) এতদিন পর্যন্ত শিল্পের কেন্দ্র ছিল ইউরোপ, তারাই জগতের কাঁচামাল নিত ও শিল্পদ্রব্য পাঠাত। এখন আর তা হবে না। শিল্পের কেন্দ্র নানা জায়গায় গড়ে উঠেছে, আর পশ্চাৎপদ দেশগুলিও শিল্পপ্রধান হতে চাচ্ছে। (২) এপর্যন্ত যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচামালের চাহিদা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী

ছিল না, বরং পরিপূরক ছিল। এখন এই ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেওয়া আশ্চর্য নয়। (৩) যে সব দেশ আগে বহুল পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল রপ্তানি করত এখন তাদের ঝোঁক শিল্পের উপর পড়ায় অনেকক্ষেত্রে তাদেরও কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য আমদানি করবার সম্ভাবনা। তাতে কৃষির অবনতির সম্ভাবনাও আছে। (৪) তাছাড়া রাজনৈতিক গোলমাল হলে তার প্রভাবও শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতির উপর পড়বে।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার নমুনা

এই সব ভেবে যুদ্ধোত্তর যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিজেদের সুবিধামত গড়ে নেবার জন্য ইতিমধ্যেই অনেক দেশই উঠেপড়ে লেগে গিয়েছে। বড় বড় দেশগুলি সকলের সমান অধিকারের জন্য বড়গলায় চিৎকার করছেন, তাঁদের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু তাঁদের অপ্রতিহত প্রাধান্য বজায় রাখা। ছোট ছোট (বা অনগ্রসর) দেশ-গুলি সেইজন্য সেদিকে কর্ণপাত না করে শুল্কপ্রাচীর ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে আন্তর্জাতিকতার হাত থেকে রেহাই পেতে চায়, তাদের মনের ভাবটা হচ্ছে, কি দরকার বড়লোকদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে, তার ঠাট বজায় রাখতে রাখতে প্রাণ যাবে, তার চেয়ে নিজেদের মধ্যেই মোটা ভাতকাপড়ে সচ্ছল হওয়া ভাল। এখন পর্যন্ত যতরকম যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে তাদের এই দুই দলে ভাগ করা চলে। আগে বড়দের পরিকল্পনাগুলি আলোচ্য। আটলান্টিক সনদে এ সম্বন্ধে সব প্রথম উল্লেখ ছিল। ঐ সনদের চতুর্থ অনুচ্ছেদটি হচ্ছে, Fourth, they will endeavour, with due respect for their existing obligations, to further the enjoyment by all states, great or small, victor or vanquished, of access on

equal terms, to the trade and to raw materials of the world which are needed for their economic prosperity। কিন্তু অতিভক্তি চোরের লক্ষণ বলে একটা প্রবাদ আছে। তেমনই, যুদ্ধোত্তর যুগের উদ্দেশ্য হবে ছোট-বড় জেতা-বিজিত নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্রের আর্থিক প্রাচুর্যের (সচ্ছলতা নয়, প্রাচুর্য—মাত্র improvement নয়, কথাটি হচ্ছে prosperity !) জন্য যে কাঁচামাল ও ব্যবসা দরকার তাই দেওয়া—এতখানি উদারতা ও বিশ্বপ্রেম যেন বাড়াবাড়ি শোনায়। আর বাস্তবিক পক্ষে ইতিমধ্যেই এই বিশ্বপ্রেমের মেকি ধরা পড়ে গিয়েছে। সম্প্রতি ব্রেটন উডসে যুদ্ধোত্তর আর্থিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ এখনও এদেশে এসে না পৌছলেও তার মোটামুটি পরিকল্পনাটা হচ্ছে এই রকম :—আন্তর্জাতিক কারবারে সাহায্য করবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক স্টেবিলিজেশন ফণ্ড থাকবে, আর থাকবে একটি আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং-হাউস। এই ক্লিয়ারিং-হাউসের মধ্য দিয়েই জিনিস ও মূলধন চলাচল হবে এবং কোনও দেশ যদি তার নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি ঋণ নেয় বা ঋণ দেয় তাহলে তার আগে তাকে ক্লিয়ারিং-হাউসের অনুমতি নিতে হবে। উত্তম কথা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই ক্লিয়ারিং-হাউস যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করবে সে ভারসাম্যের ভিত্তি কি? এ কথা তো বোঝা যায় যে যদি এখন আমরা দেড়শ বছর আগের অবস্থায় পিছিয়ে যাই এবং জগতে ইংলণ্ডই একমাত্র শিল্পপ্রধান দেশ থাকে তা হলে তো গতশতাব্দীর মত চমৎকার ভারসাম্য এখনই স্থাপিত হতে পারে। কিন্তু তা তো এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নয়। আমেরিকা প্রভৃতি দেশের প্রাধান্য স্বীকার করেই তো এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। সুতরাং যদি ভারতবর্ষ বা চীন প্রভৃতি অনগ্রসর দেশ বলে

যে তারা চিরকালই তাই থাকবে না, তাদের আর্থিক প্রাচুর্য মানে মাথাপ্রতি ৭০৲ বাৎসরিক আয়ের বদলে মাত্র ১০০৲ বাৎসরিক আয় হওয়া নয়, তারাও ইংলণ্ড-আমেরিকার সমান হতে চায়, তাহলে তার উত্তর এই পরিকল্পনায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং এসব পরিকল্পনায় সেরকম সম্ভাবনার কোনও স্থান যে নেই তা প্রকারান্তরে জানিয়েই দেওয়া হয়েছে। যে কেন্‌স্‌ পরিকল্পনা হতে এই পরিকল্পনার উদ্ভব তাতে ছিল যে both overdraft limits for deficit (over-import) countries and balance limit for surplus (over-export) countries would be proportional to their foreign trade during the base period। এ কথার মানে কি এই যে, এখন যে সব দেশ অনুন্নত তাদের চিরকালই সেই ভাবে থাকতে হবে, তাদের কারবার সেই base periodএর proportionএর বেশি কোনও কালেই হতে পারবে না? অবশ্য এ ছাড়াও অন্যান্য সমস্যা আছে। যেমন, জগতের অধিকাংশ সোনাই আমেরিকার হাতে, তার খানিকটা পুনর্বণ্টন না হলে ক্লিয়ারিং চলতে পারে না। কিন্তু এ সব সমস্যার চেয়ে বড় সমস্যা হল ঐখানে। এই সব কারণেই ছোট ছোট দেশ যে সব পরিকল্পনা করছে তারা বাইরের প্রভাব থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখতে আগ্রহশীল। বোম্বাই পরিকল্পনায় বিদেশী মূলধন আমদানি করবার আগ্রহ মোটেই নেই, এটা আকস্মিক নয়।

যুদ্ধোত্তর যুগের আসল সমস্যা

যুদ্ধোত্তর যুগের আসল সমস্যা হচ্ছে দুটি। তার প্রথমটি হচ্ছে, অনুন্নত দেশগুলির সমস্যা। যতদিন পর্যন্ত অনুন্নত দেশগুলি অপেক্ষাকৃত অনুন্নতই থাকবে এই কথা ধরে নিয়ে কোনও পরিকল্পনা রচিত হবে

ততদিন পর্যন্ত সে পরিকল্পনার অসাফল্য অবধারিত। চারপাশ হতে বাধানিষেধ, সংরক্ষণ-নিয়ন্ত্রণ, বিবাদ-বিসম্বাদ এত প্রবল হয়ে উঠবে যে তা হতে আন্তর্জাতিক আর্থিক গোলমাল অনিবার্য। 'কালান্তর'এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে রেলযানে ফার্স্টক্লাস গাড়িও থার্ডক্লাস গাড়িকে ছেড়ে চলতে পারে না। সুতরাং ফার্স্টক্লাস গাড়ির চলতে হলে থার্ডক্লাস গাড়িরও চলা চাই। এখন এর উপর আবার থার্ডক্লাসের যাত্রীরাও সুখ-সুবিধা চাচ্ছে, তা না হলে 'অ্যালার্ম সিগন্যাল' টানতেও ইতস্তত করছে না। সুতরাং তার জন্য ফার্স্টক্লাস গাড়িগুলিকে হেঁচকা টানে থামতে হচ্ছে। অতএব যে যাত্রীরা ভবিষ্যৎ সুখসুবিধার জন্য আপাতত ক্ষতিস্বীকার করতে রাজি তাদের দাবি না মেটালে গোটা ট্রেনটাই নির্বিবাদে চলতে পারবে না। এই হল প্রথম সমস্যা। যে সব দেশ ভবিষ্যতে বড় হবার আশায় আপাতত সমস্ত আপেক্ষিক লাভ ত্যাগ করতে রাজি আছে তাদের কাছে আপেক্ষিক লাভের লোভ দেখান বৃথা। আর জগতে যদি এই মনোবৃত্তিই প্রবল হয়ে ওঠে তাহলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব সম্পূর্ণ নতুনভাবে পুনর্লিখনের প্রয়োজন হবে।

দ্বিতীয়ত, পূর্বেই বলা হয়েছে অর্থনৈতিক বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারা হচ্ছে কৃষি হতে শিল্প, শিল্প হতে বাণিজ্য। পূর্বে যে সব দেশ কৃষিপ্রধান ছিল তারা ক্রমে শিল্পপ্রধান হয়ে উঠছে, যে সব দেশ শিল্প-প্রধান ছিল তারা ব্যবসা-প্রধান হয়ে উঠছে। ১৮৭১ সালে ইংলণ্ডের কার্যলিপ্ত জনসংখ্যার শতকরা ১৪.১% ভাগ ছিল কৃষিতে নিযুক্ত, শিল্পে-নিযুক্ত ছিল ৪৪.৪%, আর ব্যবসা প্রভৃতিতে নিযুক্ত ছিল ৪১.৫%। ১৯০১ সালে তা হয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮.৪%, ৪৬.৩%, ৪৫.৩%। ১৯৩৬ সালে তা আবার হয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.৯%, ৪২.২%, ৫৩.১%। ১৮৭০ সালে আমেরিকার অনুরূপ হিসাব ছিল যথাক্রমে ৫৩.৮%,

২২.৬%, ২৩.৬%। ১৯৩৭ সালে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৫.৪% ২৮.৮% ও ৪৫.৮%। অস্ট্রেলিয় পণ্ডিত কলিন ক্লার্ক আন্দাজ করেছেন যে, ১৯৬০ সালে পূর্বোক্ত হিসাবগুলি এই রকম দাঁড়াবে:—(১) ইংলণ্ড, যথাক্রমে ৪.২%, ৪৪.১%, ৫১.৭%, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, যথাক্রমে ১৬.৪, ২৬.৫%, ৫৭.১%, কানাডা, যথাক্রমে ২৩.৬%, ১৭.৫%, ৫৮.৯%, ভারতবর্ষ, যথাক্রমে ২৭.৭%, ৫৭.৩%, ১৫.০%। এত হিসাব না কষেও এর মূল সত্যটি বোঝা যায় এবং গ্রহণ করা যায়।

কিন্তু এইটিই যদিও এ পর্যন্ত বিবর্তনের প্রচলিত ধারা তবুও নানা-কারণে এই বিবর্তনের ধারায় আমাদের বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই বিবর্তন-ধারার অন্তর্নিহিত ভঙ্গীটা বোঝা দরকার। আদিম যুগের উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মানুষে উৎপাদন করে নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। আদিম এবং প্রাথমিক স্তরের জীবিকাও অনেকাংশে তাই। চাষীরা নিজেদের খাবার রেখে তারপর কিছু উদ্বৃত্ত ধানচাল থাকলেই তবে তা বিক্রি করে। কিন্তু সমাজে জটিলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থা থাকে না, তখন উৎপাদন হয় অপরের জন্য যতটা নিজের জন্য ততটা নয়। কথায় বলে ময়রা সন্দেশ খায় না। অর্থাৎ সন্দেশটা হচ্ছে তার শিল্পজ পণ্য, খাবার জিনিস নয়। তেমনি যে মজুর ভাল ভাল কাপড় তৈরি করছে সে নিজে বস্ত্রহীন। শিল্পের তুলনায় ব্যবসাটা হল আরও ফাঁকির জিনিস, সমাজের আরও জটিলতা বাড়ার চিহ্ন। শিল্পপতি ও শ্রমিকেরা তবু তো এমন একটা পদার্থ উৎপাদন করেন, যা ছোঁওয়া-নাড়া যায়, কিন্তু ব্যবসাটা হল ওর তুলনায় অনেকখানি হাওয়ার উপর কারবার। একটা জায়গায় একটা জিনিস পাওয়া যায় না, ঠিক সময় বুঝে ঠিক জায়গায় তা এনে দিতে পারলে প্রচুর লাভ। কোনও জিনিস তৈরি করতে হল না, লাভটা হল শুধু ব্যবসাবুদ্ধির জন্য। এই কারণে কৃষির

চেয়ে শিল্পে বেশি লাভ, শিল্পের চেয়ে ব্যবসায়ে বেশি লাভ। কিন্তু যদি একটা দেশের সকলেই কৃষি ও শিল্প ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করতে চায় তা হলে তো বিপদ। ব্যবসাটা হবে কি নিয়ে? সকলেই যদি ভাবে আমি নিজে কিছু উৎপাদন করব না শুধু বুদ্ধি খেলিয়ে অপরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে লাভ করব তাহলে এরকম সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হতে গিয়ে সবাই ঠক্‌বে। জাতীয় ক্ষেত্রে এরকম অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল বলেই বর্তমানে কথা উঠেছে ভোগের জিনিস (consumers' goods) বাড়াতে হবে, নিরন্ন চাষী চাষ করবে অন্য দেশে রপ্তানির জন্য ধানচাল, নির্বস্ত্র মজুর তৈরি করবে অন্যের জন্য ভাল ভাল কাপড়—এ চলবে না। অর্থনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সুখসাধন, নানাধরনের উৎপাদন হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। কিন্তু যখন উপায়টাই উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে, যন্ত্র যন্ত্রীর আসন গ্রহণ করে, তখন বিপদ অনিবার্য। সুতরাং এ কালের তৃতীয় পরিকল্পনায় উপায়ের চেয়ে আবার উদ্দেশ্যটাকেই বড় করে তোলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই কথাটা সত্য। ইংলণ্ড তার কার্যলিপ্ত জনসংখ্যার কেবলমাত্র ৪.৯% কৃষিতে নিয়োগ করে ৫৩.১% ব্যবসাতে নিযুক্ত করে রাখতে পারে তার একমাত্র কারণ জগতে এখনও বহুদেশ আছে যেখানে শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিতে নিযুক্ত। কিন্তু যদি জগতশুদ্ধ সমস্ত জাতিই একযোগে বলে যে প্রত্যেকেই শুধু ব্যবসা করব কারণ ব্যবসাই হচ্ছে বিবর্তনের শেষ ধাপ এবং চরম লাভের উপায় তাহলে তৎক্ষণাৎ সংকট দেখা দেবে। আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, চীন—প্রত্যেকেই বহু জাহাজ তৈরি করে ব্যবসার জন্য প্রস্তুত হল, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যদি জাহাজে পাঠাবার পণ্য না থাকে তাহলে জাহাজ কি হবে? প্রথম সমস্যাটির সঙ্গে দ্বিতীয় সমস্যাটিও সেই কারণে বিবেচ্য। শুধু অনুন্নত দেশগুলিকে উন্নত করলেই সমস্যার অন্ত হল না,

তাদের কোনটি কতদূর বাড়বে এবং সর্ব-জাগতিক প্রয়োজন মেটাতে কার কি কাজ হবে এবং কার কতটুকু আয় দরকার এটাও স্থির করতে হবে।

সেইজন্য যদি ভবিষ্যত সংকট হতে ত্রাণ পেতে হয় তাহলে শুধু এই হাওয়ার উপর কারবার এবং কেবলমাত্র রাতারাতি বড়লোক হবার চেষ্টা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয়ক্ষেত্রেই ত্যাগ করতে হবে। জাতীয় পরিধির মধ্যে যেমন দরিদ্রের সংখ্যাই বেশি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনই দরিদ্র দেশের সংখ্যা বেশি। সত্যিকারের ব্যবসা তখনই বাড়বে যখন এই দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি হবে, তাদের জীবনযাত্রা (সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ জিনিসের চাহিদাও) বাড়বে এবং ক্রয়শক্তিও বাড়বে। জাতীয়-ক্ষেত্রে এই কথাটার উপলব্ধি আজকাল অনেক সময় হচ্ছে। যে সব দেশে বিপ্লব ঘটেছে, যেমন রুশিয়া, সেখানে জিনিস উৎপাদন হয় উৎপাদনের স্বার্থে নয় মানুষের সুখ-সুবিধার জন্য। যে সব দেশে বিপ্লব হয় নি, যেমন ইংলণ্ড, তারাও ঢেকে চুকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাটা একটু আধটু স্বীকার করতে আরম্ভ করেছে। অর্থনীতির 'থিওরি'তে 'ভোগসামগ্রী' বাড়াবার ধুয়ো উঠেছে তার কারণ এই-ই। কিন্তু শুধু জাতীয় পরিধির মধ্যে কথাটা বুঝলেই চলবে না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কথাটা বোঝা দরকার। জগতের সুখ-সুবিধার জন্য এতটা কৃষিজ দ্রব্য, এতটা শিল্পজ দ্রব্য এবং এতটা ব্যবসার দরকার আছে—তার মধ্যে এই দেশ এখন শিল্প-ব্যবসায়ে অন্যায় রকম পিছিয়ে থাকার জন্য অসুবিধা ভোগ করছে—সুতরাং তাদের শিল্প-ব্যবসা অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে বাড়ান হোক—তাদের সেই বিবর্তন কতটা দ্রুতগতিতে হতে পারে তা তাদের কিসে কিসে কতটা আপেক্ষিক লাভের সম্ভাবনা আছে তার হিসাব কষে নির্ধারিত হোক,—যেখানে আপেক্ষিক লাভের আপাতত সম্ভাবনা নেই তবুও বিবর্তন দরকার সেখানে সেই সব দেশকে অন্য দেশ সাহায্য

করুক, ক'রে জগতের মোট যে যে জিনিস দরকার তা উৎপন্ন হোক। এইভাবে যখন জগতের যা দরকার তা সব উৎপাদন হল তখন আর এক ধাপ এগনো হোক—সেই দরকারের মাত্রা আরও বাড়ান হোক, এমন ব্যবস্থা হোক যাতে প্রত্যেকটি দেশ এবং প্রত্যেকটি দেশে প্রত্যেকটি লোক উন্নত হতে উন্নততর জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। এ না হলে শেষ পর্যন্ত নিস্তার নেই; কেননা কি-বা জাতীয় ক্ষেত্রে কি-বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের একটা সর্বজাতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ভার-সাম্য না হলে সংকট ও দুঃখ হতে ত্রাণ পাওয়া যাবে না,—আর ওরকম ভারসাম্যও ততদিন হতে পারবে না যতদিন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য থাকবে মানুষের অভাব মোচন না করে সেই অভাবের সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থসাধন। এইখানেই বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গী আগের তুলনায় অন্য। গত শতাব্দীর সমস্ত অর্থনৈতিক 'থিওরি'র ভিত্তি ছিল মানুষের অভাব ও তার সুযোগ গ্রহণ। আজকালকার দৃষ্টিভঙ্গীতে তা অধর্ম। এই অধর্ম হতে কিছুকাল স্ফূর্তি করা চলতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হতে তারও ধ্বংস হয়, সমূলে বিনাশ ঘটে থাকে। জাতীয় বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যে এই যুদ্ধের পরও ঠিক চলবে না তার কারণ এখনও প্রত্যেক দেশে এমন বহু লোক আছে এবং জগতে এমন বহুদেশ আছে যারা দুর্বলদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই অধর্ম চালাবার কিছু ক্ষমতা রাখে অথচ যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে না, যারা অত্যাচারিতদের উপর এখনও অত্যাচার করতে পারছে অথচ অত্যাচারিতদের ক্রমিক শক্তিবৃদ্ধি নিবারণ করতে পারছে না। এই মহাযুদ্ধের পর এই সমস্ত সমস্যা যে আরও প্রবল হয়ে উঠবে তার কারণ সর্বত্রই মালিকদের দিন ঘনিয়ে আসছে বলে তাঁরা অনুভব করছেন এবং তা অনুভব করছেন বলেই তাঁরা সচেতনে বা অবচেতনে লোভ ও অত্যাচারের মাত্রা না বাড়িয়ে পারছেন না বা পারবেন না।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক বলিয়া বিবেচ্য। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত পুস্তকে বিষয়বস্তুর আলোচনা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ হইতে বিস্তৃততর হইবে।

"শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে, এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে; অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না।

"বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।"

—লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ

১. বিশ্বপরিচয়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. প্রাচীন হিন্দুস্থান: শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
৩. পৃথ্বীপরিচয়: শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪. আহার ও আহার্য: শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
৫. প্রাণতত্ত্ব: শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬. বাংলাসাহিত্যের কথা: শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী
৭. ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা:
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়